ম্যাক্সিম গর্কী

অনুবাদ ঃ

অমল দাশগুপ্ত

। ন্যাশনাল বুক ক্লাব । কলিকাতা ।

প্রথম সংস্করণ : ১৯৫৫

প্রচ্ছদপট :
পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

দাম ছু'টাকা আট আনা

প্রকাশক : বিমল মিত্র, ৬, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২
মুদ্রাকর : শ্রীমুরারিমোহন কুমার, শতাব্দী প্রেস লিঃ, কলিকাতা—১।

ঝ'ড়ো হাওয়া; শুকনো ধূমল বরফ, খড়কুটো আর গাছের বাকলের টুকরো ঘূর্ণির মতো উড়িয়ে আছড়ে পড়ছে উঠোনের ওপরে। আর তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট চেহারার একটি মানুষ। পরনে ডোরা-কাটা সুতি-কাপড়ের তৈরি গোড়ালি পর্যন্ত ঝোলানো তাতার শার্ট, রবারের উঁচু গালোশ পরা খালি পা। বিপুলায়তন ভুঁড়িটাকে দুই হাতে চেপে ধরে থ্যাবড়া থ্যাবড়া বুড়ো আঙুলদুটোকে প্রচণ্ডভাবে মোচড় দিচ্ছে। ভাঁটার মতো গোল গোল চোখ, একটির সঙ্গে অপরটির মিল নেই; ডান চোখটা সবুজ, বাঁ চোখটা পাঁশুটে। অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকায় আর চড়া ক্যান্‌কেনে গলায় বলে:

'ভাগো, ভাগো! এখানে কোনো কাজকর্ম জুটবে না! বলি শীতকালে কাজকর্ম পাওয়া যায় শুনেছ কখনো?'

দাড়িবিহীন থল্‌থলে মুখটা অবজ্ঞায় ফুলে উঠেছে, দুমড়ে বেঁকে গেছে ওপরের ঠোঁটের অস্পষ্ট একটুখানি গোঁফ, নিচের ঠোঁটটা বিরক্তিতে ঝুলে-পড়া; আর দেখা যাচ্ছে ঘনসংবদ্ধ একসারি ক্ষুদে ক্ষুদে দাঁত। চওড়া কপাল, পাতলা চুল। নভেম্বরের প্রগল্‌ভ বাতাসের ঝাপটায় চুলগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। দম্‌কা বাতাসে পরনের জামাটা আচমকা হাঁটুর ওপরে উঠে

গিয়ে পা বেরিয়ে পড়ে। মসৃণ পা, বোতলের মতো দেখতে, হলদে হলদে নরম লোমে ঢাকা। পা বেরিয়ে যেতে আরেকটা ব্যাপারও চোখে পড়ে; পায়ের মালিকের পরনে পাৎলুনের কোনো বালাই নাই। মানুষটা এতবেশি কুৎসিত যে চোখ ফেরানো যায় না, কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। আমার বিশেষ কোনো তাড়া নেই; লোকটির সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলেই দেখা যাক্ না। জিজ্ঞেস করলাম :

'তুমি বুঝি দারোয়ান ?'

'ভাগো, ভাগো, সে খবরে তোমার কি দরকার...'

'আরে ভাইয়া, পাৎলুন পরোনি, ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে...'

চোখের ভুরু বলতে একজোড়া লাল লাল ছোপ। লাল ছোপদুটো কপালে উঠে আসে, বিসদৃশ চোখদুটো বড়ো অদ্ভুতভাবে নাচতে থাকে, আর মানুষটার শরীর এমনভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে যে মনে হয় এক্ষুনি বুঝি পড়ে যাবে।

'আর কিছু বলবার আছে ?'

'ঠাণ্ডা লেগে মরবে যে !'

'আর কিছু ?'

'না, এই কথাই।'

'বাস, যথেষ্ট বলা হয়েছে !'

হাতের বুড়ো আঙুলে মোচড় দেওয়া বন্ধ করে একটা হুঙ্কার ছাড়ে সে। মুঠি খুলে ছড়িয়ে দেয় হাতদুটো, কোমরের কাছে মাংসল জায়গায় আলতোভাবে চাপড় মারতে মারতে আর বাতাসের ধাক্কায় আমার দিকে একটু নুয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করে :

'তোমার মতলবটা কি ?'

'না, কিছু নয়। মালিক ভাসিলি সেমিয়োনভের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। কি বলো, একবার দেখা হতে পারে ?'

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে আর সবুজ চোখটা দিয়ে আমাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে করতে লোকটি বলে :

'সামনেই তো রয়েছি…'

আমার চাকরি পাবার আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। বাতাসে শরীরটা আরো বেশি শির শির করে ওঠে, লোকটাকে আরো বিশ্রী মনে হয়।

ঠাট্টার সুরে সে বলে : 'কী হে—কি যেন বলছিলে? দরোয়ান—না?'

এবার আমার খুব সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি বুঝতে পারি, সাংঘাতিক রকমের মাতাল অবস্থায় রয়েছে সে। চোখের ওপরে ঢিবি-মতো লাল জায়গাটা হলদে লোমে ঢাকা; এত পাতলা যে চোখেই পড়ে না। সব মিলিয়ে তাকে দেখতে হুবহু একটা অতিকায় মুরগি-ছানার মতো।

'ভেগে পড়ো!' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে সে। মুখে উগ্র মদের গন্ধ; সেই গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে আমার চারদিকে। গ্যাঁটা গ্যাঁটা হাত। হাতটা দোলাচ্ছে; মুঠি করা হাত দেখতে হয়েছে কর্ক সমেত একটা শ্যাম্পেনের বোতলের মতো। তার দিকে পিছন ফিরে আমি পায়ে পায়ে সদর রাস্তার দিকে এগিয়ে চললাম।

'শুনে যাও হে! মাসে তিন রুবলে পোষাবে?'

সতেরো বছরের যোয়ান ছেলে আমি, স্কুলে লেখাপড়া শিখেছি। আর আমাকে কিনা এই হোঁদল কুঁৎকুঁত মাতালটার কাছে দশ কোপেক রোজে কাজ করতে হবে! কিন্তু সময়টা শীতকাল, হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই আমি বললাম :

'আচ্ছা বেশ।'

'কাগজপত্তর সব ঠিক আছে তো?'

আমি বুক পকেটে হাত ঢুকিয়েছিলাম কিন্তু আমার মনিব বিরক্তির সঙ্গে হাত নাড়ল…

'ঠিক আছে! কেরানির হাতে দিও।…ভিতরে যাও…সাশ্‌কার খোঁজ করো গে…'

পলেস্তারা-খসা হলদে দোতলা একটা দালান; তারই দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো নড়বড়ে একটা চালা। ভিতরে ঢুকবার দরজাটা একটিমাত্র কবজার ওপরে ঝুলে আছে। দরজা পার হয়ে সারবন্দী

ময়দার বস্তার মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে আমি গিয়ে পৌঁছলাম সরু ঘুপ্‌সি একটা জায়গায়। উষ্ণ বাষ্প এসে নাকে লাগছে, টক টক গন্ধ, খিদে জাগিয়ে তোলে। হঠাৎ উঠোনের দিক থেকে আতঙ্কজনক একটা গোলমালের শব্দ ভেসে এল। প্রচণ্ডভাবে কে যেন পা ঠুকছে আর নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করছে। যাতায়াতের গলির দেওয়ালে একটা ফাটল ছিল; দেওয়ালে মুখ চেপে সেই ফাটল দিয়ে তাকিয়ে যে দৃশ্য আমার চোখে পড়ল তাতে আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার মনিব কোমরে হাত রেখে মহানন্দে উঠোনময় নৃত্য করে বেড়াচ্ছে; অনেকটা ঘোড়ার মতো তিড়িং তিড়িং করে লাফঝাঁপ দেওয়া, যেন অদৃশ্য একজন লোক ঘোড়াটাকে তালিম দিতে গিয়ে খোঁচা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে চকিতে দেখা যাচ্ছে, আদুড় পায়ের ডিম আর মোটা-মোটা গোল-গোল হাঁটু; ভুঁড়ি আর মাংসল গাল কাঁপছে। কুঁচকে গেছে মাছের মতো মুখ, নিশ্বাস ফেলছে ফোঁস ফোঁস করে আর শ্বাস টেনে টেনে দুর্বোধ্য চিৎকার করছে:

'হুপ! হুপ!'

উঠোনটা সরু। চারদিকে জড়াজড়ি করে আছে ভাঙাচোরা হেলে-পড়া বাইরের-বাড়ির বিশৃঙ্খল একটা সমাবেশ। ঘরের দরজায় দরজায় ঝুলছে কুকুরের মাথার মতো প্রকাণ্ড এক-একটা তালা। অসংখ্য গাঁটওয়ালা পাতা-ঝরা বৃষ্টি-ধোয়া একটা গাছ; অন্ধের মতো তাকিয়ে আছে গাঁটগুলো। উঠোনের এককোণে ছাদপ্রমাণ উঁচু আবর্জনার মতো জড়ো-করা চিনির খালি চোঙ; কুচি কুচি খড়ের টুকরো লেগে আছে চোঙের গোল মুখগুলোতে। উঠোনটাকে দেখে মনে হয়, আস্তাকুড় হিসেবেই উঠোনটার ব্যবহার; প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার পরে যে-সব জিনিস বাতিলের পর্যায়ে এসে গেছে সেগুলোর স্থান হচ্ছে এই উঠোন।

এই খড়কুটো আর গাছের বাকলের ঘূর্ণির মধ্যে ও কুচি-কুচি কাঠের টুকরোর আবর্তনের মধ্যে দৃশ্যত মিশে গিয়ে এই শিথিল-শরীর, গুরুভার, প্রকাণ্ড ওজনের মোটা আর অদ্ভুত লোকটিও আহ্লাদে নেচেকুঁদে বেড়াচ্ছে।

গালোশ-পরা পায়ের ভারী আওয়াজ উঠছে পাথর-বাঁধানো উঠোনে। সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসটানা স্বরে চিৎকার :

'হুপ! হুপ!...'

ঘুপ্‌সিটার পিছন দিকে কোথা থেকে যেন একপাল শুয়োর পাল্‌টা ফোঁসফোঁসানি ও ঘোঁৎঘোঁৎ চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। শ্বাস টেনে টেনে পা দাপাচ্ছে একটা ঘোড়া কোথায় যেন। তিনতলার একটা ঘরের বাতাস বেরোবার জানলাটা খোলা; সেই ফাঁক দিয়ে মন্থরভাবে ভেসে আসছে মেয়েলি গলায় গানের সুর :

কেন এত বিরস বদন
হায় গো আমার নাগর
হায় গো মুসাফির!

চোঙগুলোর মুখে বাতাস উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, হুটোপাটি লাগিয়েছে খড়গুলোকে নিয়ে। দ্রুত একটানা পৎপৎ শব্দ হচ্ছে কাঠের একটা টুকরো থেকে। একটুখানি উত্তাপের আশায় পায়রাগুলি গায়ে গা ঠেকিয়ে ঝাঁক বেঁধে রয়েছে গোলাঘরের কার্নিসে; করুণ সুরে ডাকাডাকি চলেছে তাদের।

জীবন এখানে অদ্ভুত রকমের ঘোঁট পাকানো। আর সব কিছুর কেন্দ্রস্থলে রয়েছে এই উদ্ভট মূর্তিটি। দরদর করে ঘামছে, হাঁপাচ্ছে আর অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে। এমনটি এর আগে আমি আর কখনো দেখিনি।

একেবারে নরককুণ্ডে এসে হাজির হয়েছি! মনের মধ্যে খানিকটা আশঙ্কা নিয়ে ভাবলাম।

একতলায় ছোট ছোট জানলা। তারের জাল দিয়ে বাইরের পৃথিবী থেকে জায়গাটুকুকে আড়াল করা হয়েছে। হুমড়ি খেয়ে পড়া সিলিং। জড়াজড়ি করে ঝুলে আছে বাষ্প আর তামাকের ধোঁয়া। গুমোট ও বিষণ্ণ আবহাওয়া। জানলার শার্সিগুলো ভাঙাচোরা; শার্সিগুলোর ভিতরের দিক ময়দার লেইয়ে মাখামাখি, বাইরের দিকে কাদার ছিটে। কোণে কোণে ছেঁড়া ন্যাকড়ার স্তূপের মতো মাকড়সার জালের ঘোষণা। মাকড়সার জালে

ময়দার গুঁড়োর মিহি আস্তরণ পড়েছে। এমন কি ঠাকুরের আসনের চৌখুপিটা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে ছাইয়ের মতো ধুলোর নিচে।

নিচু খিলান দেওয়া মস্ত চুল্লিতে সোনালী রঙের আগুনের ঝলক উঠছে। আর সেই আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে পিচ্‌কেল ধরনের একটি লোক। মস্ত হাতলওলা একটা বেল্‌চা চুল্লির মধ্যে ঢুকিয়ে ব্যস্তভাবে নেড়ে চলেছে। এই লোকটি হচ্ছে পাশ্‌কা জিপসি। ওর কাজ রুটি সেঁকা; আর ও হচ্ছে এই কারখানার প্রাণ। ছোট্ট মানুষটি, মাথায় কালো চুল, ছোট ছোট চেরা দাড়ি আর ঝকঝকে সাদা দাঁত। পরনে ঢিলেঢালা বোতাম-খোলা লাল শালুর কাপড়ের আলখাল্লা। বুকটা খোলা, বুকের লোমগুলো চক্রাকারে পাক খেয়ে বিচিত্র একটা নক্‌শার রূপ নিতে চলেছে। রোগা চটপটে চেহারা, দেখে মনে হয় যেন সরাইখানার নাচিয়ে। সুডোল পায়ে জীর্ণ বুটজুতো, ঢালাই করা লোহার পাতের মতো দেখতে; সেই জুতোর দিকে তাকালে কষ্ট হয়। এই বিষণ্ণ অবরোধের মধ্যে ওর খুশিভরা সুরেলা গলার স্বরে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ওঠে।

সুন্দর কপালের ওপর কালো চুলের গুচ্ছ: কপালের ঘাম মোছে আর অনর্গল গালিগালাজ দিতে দিতে চিৎকার করে ওঠে: 'সেঁকা দাও, ফোটাও!'

দেওয়ালের ধারে জানলার নিচে লম্বা একটা টেবিল। সেই টেবিলের সামনে বসে আঠারো জন লোক কাজ করে। ক্লান্ত ছন্দে তালে তালে দোলে তাদের শরীর। এদের কাজ হচ্ছে বিস্কুট তৈরি করা। পাউণ্ডে ষোলটা হিসেবে 'B' অক্ষরের মতো বিস্কুট। টেবিলের একেবারে ধারে যে দুজন লোক থাকে তারা ময়দার লেইকে টেনে টেনে লম্বা করে, ফালি ফালি করে কাটে, তারপর অভ্যস্ত হাতে ফালিগুলোকে সমান সমান লেচিতে ভাগ করে ঠেলে দেয় অন্যদের নাগালের মধ্যে। অন্যরা কাজ করতে করতেই সেগুলো তুলে নেয়। এত তাড়াতাড়ি এবং এমন অনায়াসে তাদের হাত চলে যে চোখে দেখে ঠাহর করা যায় না। হাত দিয়ে চাপড় মেরে মেরে তারা লেচিটাকে বিস্কুটের আকার দেয়। কারখানা-ঘরটা ভরে থাকে নরম জিনিসের ওপর অনবরত চাপড় মারার শব্দে। টেবিলের অন্য ধারে

আমার জায়গা। আমার কাজ এই বিস্কুটের আকার দেওয়া লেচিগুলোকে তুলে তুলে একটা ট্রেতে সাজিয়ে রাখা। এক-একটা ট্রে সাজানো হয়ে গেলে ছেলেরা সেগুলো নিয়ে যায় ফোটানীর কাছে। সেখানে মস্ত একটা পাত্রে জল ফুটছে। ফুটন্ত জলের মধ্যে লেচিগুলোকে একটা একটা করে ছেড়ে দেয় লোকটি, মিনিটখানেক পরেই আবার একটা তামার হাতা দিয়ে ছেঁকে ছেঁকে তুলে নিয়ে জড়ো করে তামার ওপরে টিনের আস্তর দেওয়া লম্বা একটা বারকোশের ওপরে। লেচির টুকরোগুলো তখন পিচ্ছিল আর গরম হয়ে থাকে, তখন সেগুলোকে আবার সাজিয়ে রাখে ট্রে-র ওপরে। পোড়ানী প্রথমে এই ট্রে-গুলোকে আগুনের আঁচে শুকিয়ে নেয়, তারপর বেল্‌চার ওপরে বসিয়ে দক্ষ হতে ছুঁড়ে দেয় চুল্লির মধ্যে। সেখানে সেঁকা হতে হতে লেচিগুলো মচমচে আর বাদামী হয়ে ওঠে। বাস, বিস্কুট তৈরি।

লেচিগুলোকে চাপড় দিয়ে দিয়ে বিস্কুটের আকার দেবার পর সেগুলোকে ছুঁড়ে দেওয়া হয় আমার দিকে; আমি সেগুলোকে ট্রে-র ওপরে সাজিয়ে রাখি। আমার এই কাজে যদি একটু গাফিলতি হয়ে যায় তাহলেই সমস্ত পণ্ড। লেচিগুলো গায়ে গায়ে এঁটে যায় একেবারে। তখন সবাই আমাকে গালিগালাজ করতে শুরু করে, ময়দার গুট্‌লি ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে আমার মুখে।

কেউ আমাকে পছন্দ করে না। আমার ওপরে সবার সন্দেহ, যেন আমি একটা বদ মতলব নিয়ে এসেছি।

আঠারোটা নাক আচ্ছন্নভাবে এবং একটা চরম বিতৃষ্ণা নিয়ে টেবিলের ওপর ওঠানামা করে। আর এমন অদ্ভুত ব্যাপার যে আঠারোটা মুখকেই একরকম মনে হয়; একই ধরনের বিষণ্ণ ক্লান্তির ছাপ সবার মুখে। আমাদের দলের মেশালদার ময়দা মাখে। দুম দুম শব্দ হয় লোহার মুগুর থেকে। কাজটা খুবই শক্ত। তিন মণ ময়দা মেখে এমনভাবে লেই করতে হবে যে একদিকে তা হবে যেমন আঠা আঠা, অন্যদিকে রবারের মতো নরম। আর এমনভাবে মিশ খাওয়াতে হবে যেন কোথাও একদানা ময়দাও শুকনো না থাকে। আর কাজটা করতে হবে খুবই তাড়াতাড়ি, বড়ো জোর আধ ঘণ্টার মধ্যে।

চুল্লিতে ফট্ ফট্ শব্দে কাঠ ফাটে, বয়লারে সোঁ সোঁ শব্দে জল ফোটে, টেবিলের ওপরে হাত ঘষার আর হাত দিয়ে চাপড় মারার শব্দ হয়। আর এই সমস্ত শব্দ মিলেমিশে গিয়ে একঘেয়ে একটানা একটা গুনগুনানির মতো শোনায়। কচিৎ কেউ রাগের বশে চিৎকার করে উঠে এই একঘেয়ে গুনগুনানিকে খান খান করে দেয় না। এরই মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম যোগানদার ছেলের দলের ইয়াশকা আর্তিয়ুকভ। চড়া আর তাজা গলায় সে কথা বলে যায়। এগারো বছর বয়েস, চ্যাপটা নাক, কচি চেহারা। মুখের চেহারা ক্ষণে ক্ষণে পালটাচ্ছে; এই ভয় পায়, এই মজা পায়। রুদ্ধশ্বাসে শ্রোতাদের কাছে সে গল্প বলে। উত্তেজনাপূর্ণ আর অবিশ্বাস্য সেই সব গল্প। কোন্ পাদরির বৌয়ের নাকি নিজের মেয়ের ওপরেই এমন হিংসে যে মেয়ের বিয়ের দিন মেয়ের কাপড়েচোপড়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ঘোড়াচোরদের উৎকণ্ঠা আর শাস্তির গল্প। ভূত প্রেত দৈত্যদানো আর মৎস্যকুমারীর গল্প। সুরেলা গলার স্বর ছেলেটির, অনবরত কথা বলে চলে। আর এইজন্যে সবাই ওকে ডাকে 'ঝুমঝুম' বলে।

এখানে আসার পর এর মধ্যেই আমি ভাসিলি সেমিয়োনভ সম্পর্কে অনেক খবর জেনে ফেলেছি। অল্প কিছুকাল আগে, ঠিক করে বলতে গেলে ছ-বছর আগে, সে নিজেই এই রুটি-কারখানায় কাজ করত। থাকত মালিকের বুড়ী বৌয়ের সঙ্গে। বুড়ীকে সে একটা বিদ্যে শিখিয়েছিল; মাতাল স্বামীটাকে আস্তে আস্তে বিষ খাইয়ে নিকেশ করে দেওয়া। বুড়ীর স্বামী মারা যাবার পরে সে-ই গোটা ব্যবসাটা হাতিয়ে নেয়। আর এখন বুড়ীর ওপর তার এত দাপট যে বুড়ী সব সময়ে ভয়ে কুঁকড়ে থাকে, তার চোখের আড়ালে থাকবার জন্যে ইঁদুরের মতো ফাঁকে ফোঁকরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। নেহাতই কথায় কথায় এই কাহিনী আমাকে বলা হয়েছিল। এর মধ্যে যে অসাধারণত্ব কিছু আছে তা বক্তার বলার ভঙ্গি দেখে মনে হয়নি। এমন কি তার কথাবার্তায় এমন একটু আভাসও ছিল না যে লোকটার কপাল দেখে তার হিংসে হচ্ছে।

'আচ্ছা ও পাৎলুন পরে না কেন বলতো ?'

ধীরস্থির ভাবে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে কুজিন ; লোকটির একচোখ কানা, বিষণ্ণ হিংস্র মুখ। বলে :

'কাঁড়ি কাঁড়ি মদ গিলে উঠে এসেছে যে ! এই তো গত পরশু দিনের ব্যাপার—পাল্লা দিয়ে মদ খেতে লেগেছিল। আর সহজ পাল্লা তো নয় !'

'লোকটার বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম আছে—না ?'

কয়েক জোড়া চোখ বিহ্বল ভ্রূকুটি করে আমার দিকে তাকায়। আশ্বাস দেবার মতো সুরে জিপ্‌সি বলে ওঠে :

'দুটো দিন সবুর করো, বুদ্ধি কম আছে কিনা সেটা ভালোভাবেই টের পাবে !'

মালিকের সম্পর্কে সবাই এমন সুরে কথা বলে যেন নিজেদের প্রায় একটা গবের্র ব্যাপার উল্লেখ করছে। ষাট বছরের বুড়ো কুজিন থেকে শুরু করে, অক্টোবর থেকে ইস্টার পর্যন্ত যে-লোকটা দু' রুবল মজুরিতে গাছের বাকলের সুতোয় বিস্কুটগুলো গেঁথে গেঁথে রাখে সেই ইয়াশ্‌কা পর্যন্ত, সবার কথাবার্তায় এই সুর। যেন সবাই বলতে চাইছে : চেয়ে ছাখ, ভাসিলি সেমিয়োনভ কী এলেমদার লোক ! এমন লোক দ্বিতীয় আর একজনকে খুঁজে বার করো তো দেখি ! তিন-তিনটে মেয়েলোক রেখেছে, এদিক থেকে তার বাচবিচার নেই ! দুটো মেয়েলোককে তো এমন দাবড়িয়ে রেখেছে যে তারা আর ট্যাঁ-ফোঁ করতে পারে না। আবার তিন নম্বর মেয়েলোকটা তো ওকেই ধরে মারে। লোকটার লোভের সীমা নেই, যাচ্ছেতাই খেতে দেয় আমাদের। খাওয়া বলতে বাঁধাকপির ঝোল আর ছুটির দিন হলে নোন্‌তা মাংস, নইলে নাড়িভুঁড়ি ; বুধবার ও শুক্রবার শণের তেলে তৈরি কলাই ও জোয়ারের হালুয়া। ওদিকে কাজ করিয়ে নেবার হিসেবটা ঠিক আছে—দিনে অন্তত সাত বস্তা ময়দা মাখা হওয়া চাই। সাত বস্তা ময়দা মাখা হলে পরে তার ওজনটা দাঁড়ায় বাইশ মণ আর এক-এক বস্তা ময়দার বিস্কুট তৈরি হতে আড়াই ঘণ্টা লাগে।

আমি বলি, 'মালিকের সম্পর্কে এমনভাবে তোমরা কথা বলো যে আমার ভারি অবাক লাগে।'

কুচুটে চোখদুটো পিটপিট করতে করতে পোড়ানী জিজ্ঞেস করে, 'কেন, এতে অবাক হবার কি আছে?'

'মনে হয় যেন এটা তোমাদের পক্ষে একটা জাঁক করে বলবার মতো বিষয়…'

'তা কথাটা সত্যি বইকি! তুমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছ বলে মনে হচ্ছে না। এই ধরো না কেন, যে লোকটা ছিল সাধারণ মজুর, মানুষ বলেই মনে করত না কেউ—আজ তাকে দেখে পুলিশের দারোগা পর্যন্ত সেলাম করে! এদিকে লিখতেও জানে না, পড়তেও জানে না—শুধু এক-দুই গুণতে পারে। তবুও দেখ, চল্লিশজন লোকের কতবড়ো একটা ব্যবসার সমস্তটা নিজের মাথার মধ্যে রেখেছে!'

ফোঁস করে একটা তারিফের নিশ্বাস ফেলে কুজিন বলে :

'ভগবান লোকটাকে অনেক বুদ্ধি দিয়েছে!'

পাশ্‌কা উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে :

'সহজ কথা নাকি! দু-দুটো বিস্কুটের কারখানা আবার দু-দুটো রুটির কারখানা! হিসেবপত্র না জেনেও চালাক তো দেখি কেউ! এই একটা কারখানার কথাই ধরো না কেন! গাঁয়ের মর্দ্‌ভিনীয় ও তাতার লোকগুলোর কাছে শীতকালে এই একটা কারখানার বিস্কুট বিক্রি হয় প্রায় আড়াই হাজার মণ। তা ছাড়াও আছে শহরের ব্যাপারীরা—তাদের প্রত্যেককে দিনে অন্তত এক মণ করে দুই কারখানার বিস্কুট বিক্রি করতে হয়। এসব তো আর চালাকির কথা নয়!'

পোড়ানীর উৎসাহ সীমা ছাড়িয়ে যায়, শুনলে গা জ্বালা করে। যে কোনো মনিব সম্পর্কে আমার নিজের কিন্তু অন্য রকমের ধারণা; আর সেই ধারণা যে আমার হয়েছে তার পিছনে যথেষ্ট কারণও আছে।

বুড়ো কুজিনের শয়তানি-ভরা চোখদুটো পাঁশুটে ভুরুর তলায় চাপা পড়ে গেছে; ঠেস্‌ দিয়ে দিয়ে বলে সে :

'বাপু হে, ওকে তুমি যা-তা লোক ভেবো না!'

'তা কথাটা নেহাৎ মিথ্যে বলোনি! তোমাদের কাছেই তো শুনেছি যে পুরনো মনিবকে ও বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে···'

কপাল কুঁচকে, কালো ভুরু জোড়া ঘোঁচ করে পোড়ানী আমতা-আমতা করে জবাব দেয়:

'তা যদি বলো তো নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। সাক্ষীপ্রমাণ তো আর নেই। মাঝে মাঝে লোকে হিংসে করে বা গায়ের জ্বালায় বলে বেড়ায় যে অমুক লোক অমুক লোককে খুন করেছে বা বিষ খাইয়েছে বা লুটপাট করেছে। যাকে আমরা নিজের দলের লোক বলেই জানি তার যদি হঠাৎ কপাল ফিরে যায় তবে কার আর ভালো লাগে বলো···'

'ওঃ, কী আমার দলের লোক রে!'

জিপ্‌সি জবাব দেয় না। হঠাৎ কুজিন কোণের দিকে তাকিয়ে ছেলের দলের ওপর হম্বিতম্বি করে ওঠে:

'হতচ্ছাড়া শয়তানের দল, ঠাকুরের গায়ে ময়লা পড়েছে চোখে পড়ে না বুঝি! তাতারদের মতো নাস্তিক হয়ে উঠেছিস যে সব···'

অন্তরা চুপ করে থাকে। তাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না।

বিস্কুটের লেচিগুলোকে ট্রে-র ওপরে সাজিয়ে সাজিয়ে তুলতে হয়। এ-কাজের জন্যে আমার পালা যখন আবার আসে, আমি তখন টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সবার কাছে আমার জ্ঞানের ভাণ্ডার উজাড় করে দিই। যে-সব কথা সকলের জানা উচিত বলে আমি মনে করি, তাই বলতে শুরু করি। আমাকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলতে হয় যাতে কারখানার মধ্যেকার চাপা গুনগুনানি ছাপিয়ে আমার গলার স্বর ওঠে। যখন দেখি সবাই মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছে তখন আরো উৎসাহিত হয়ে উঠি এবং আরো বেশি চেঁচাতে শুরু করি।

একদিন যখন আমি এভাবে 'জ্ঞান-বিতরণ' করছি, আমার মনিব আমাকে

সামনা-সামনি ধরে ফেলে। আমাকে সে শাস্তি দেয় আর আমার একটা নতুন নামকরণ করে।

আমাদের কারখানা আর রুটির কারখানার মাঝখানে আছে একটা পাথরের খিলান। আমি এই খিলানের দিকে পিছন ফিরে ছিলাম আর নিঃশব্দে সে এসে দাঁড়িয়েছিল এই খিলানের নিচে। আমাদের কারখানার মেঝে থেকে তিন ধাপ উঁচুতে উঠলে রুটির কারখানার মেঝে। সেই উঁচু জায়গায় খিলানের ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো সে দাঁড়িয়ে। হাতদুটো ভুঁড়ির ওপরে, হাতের বুড়ো আঙুলে অনবরত মোচড় দিয়ে চলেছে, পরনে সেই চিরাচরিত লম্বা শার্ট, ষাঁড়ের মতো গর্দানের চারদিকে একটা ফিতে বেঁধে শার্টের গলা আটকানো। দেখে মনে হয়, বিরাট একটা ময়দার বস্তা; সহজে এই বস্তাটাকে নড়ানো চড়ানো চলে না। চেষ্টা করেও অন্য কিছু ধারণা করা সম্ভব নয়।

সেই উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে সে সবাইকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। এক চোখের সঙ্গে অপর চোখের কোনো মিল নেই; যে-চোখের মণির রং সবুজ, সেটা একেবারে নিটোল গোল, আর বেড়ালের চোখের মতো চকচক করে ও কুঁচকে ছোট হয়ে যায়। অন্য চোখের মণিটা পাঁশুটে, ডিম্বাকৃতি, মড়ার মতো নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে পলকহীন ভাবে তাকিয়ে থাকে।

ওদিকে আমি কথা বলে চলেছি। হঠাৎ আমার খেয়াল হল যে কারখানার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক স্তব্ধতা নেমে এসেছে, অথচ কাজ বন্ধ হয়নি, বরং আগের চেয়েও ক্ষিপ্রতর হয়েছে। এমন সময়ে শুনতে পেলাম, আমার পিছন থেকে কে যেন ঠাট্টার সুরে বলছে:

'কিসের গল্প হচ্ছে শুনি, বকবক-মহারাজ?'

মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে থতমত খেয়ে আমি চুপ করে গেলাম। আমার পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে সবুজ চোখটার তীব্র দৃষ্টি দিয়ে সে আমার আপাদমস্তক দেখে নিল একবার। তারপর পোড়ানীকে জিজ্ঞেস করল:

'ছোকরা কেমন কাজ করে হে?'

পাশা তারিফ করার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে :

'ভালোই তো। তাগদ আছে ওর…'

থপ্ থপ্ করে পা ফেলে হেলেদুলে মনিব কারখানা-ঘরে একটা পাক দেয়, তারপর বাইরে বেরোবার দরজার সিঁড়িতে উঠতে উঠতে আলস্যভরা নরম গলায় বলে :

'ছোকরাকে ময়দা মাথার কাজে লাগিয়ে দিও……পুরো এক হপ্তা…'

বলেই সে দরজা খুলে বাইরে চলে যায়। একরাশ সাদা কুয়াশা ঢোকে কারখানা-ঘরের মধ্যে।

'আমি হলে কক্ষনো করতাম না!' ভানোক উলানভ ফুঁসে ওঠে। টিঙটিঙে চেহারা ছেলেটির, খোঁড়া পা, উদ্ধত চোখমুখ, কথায় আর হাবভাবে আশ্চর্যরকমের বেহায়া।

কে যেন বিদ্রূপের সুরে শিস দিয়ে ওঠে। পোড়ানী চারদিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়, তারপর টেবিল চাপড়ে গালিগালাজ দিযে বলে ওঠে :

'কাজে হাত লাগাও সবাই!'

ঘরের এক কোণে মেঝের ওপরে ছেলের দল বসেছিল। তাদের মধ্যে থেকে ইয়াশ্‌কা হঠাৎ ঝাঁঝালো গলায় ভৎর্সনার সুরে বলে ওঠে :

'তোমরা বেথ লোক তো! তোমরা যারা টেবিলের ধারের দিকে বথে আছ—তাদের বলছি! তোমাদের কি হুঁথ বলে কোনো পদার্থ নেই! মনিব আথ্‌ছে দেখেও লোকটাকে থাবধান করে দিতে পার না?'

'ঠি-ঠিক কথা!' মোটা মোটা হেঁড়ে গলায় তার ভাই আর্তেম সায় দেয়। বছর ষোল বয়স ছেলেটির; লড়াইযের পর মোরগের যেমন বিপর্যস্ত চেহারা হয়—তার চেহারাটাও তেমনি। বলে, 'হপ্তাভর ময়দা মাথার কাজ করা চাট্টিখানি কথা নয়—কোনো মানুষের শরীরেই এই ধাক্কা সয় না।'

টেবিলের শেষদিকে বসেছিল বুড়ো কুজিন আর ভূতপূর্ব সৈনিক মিলোভ। মিলোভ লোকটি গোবেচারা ধরনের, সিফিলিস রোগে আক্রান্ত। কুজিন

চোখ নামিয়ে নেয়, কোনো কথা বলে না। ভূতপূর্ব সৈনিকটি অপরাধীর সুরে বিড়বিড় করে বলে :

'আমার খেয়ালই হয়নি…'

আকর্ণ হেসে পোড়ানী বলে :

'এবার থেকে তোমার নাম হল বকবক-মহারাজ !'

দু-তিনজন হেসে উঠতে গিয়েও কুণ্ঠিতভাবে চুপ করে যায়। তারপর সকলের চুপ করে থাকাটা ভারি বিশ্রী লাগতে থাকে, ভারি খারাপ মনে হয়। কেউ আর আমার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারে না।

'যাই বলো, ইয়াশ্‌কা কিন্তু সবার আগে খাঁটি কথাটি ঠিক ধরতে পারে!' হঠাৎ ভারী গলার মন্তব্য শোনা যায়। কথা বলছে আসিপ শাতুনভ; কিম্ভুত চেহারা লোকটির, মুখটা কালমুক ধরনের, চোখ দুটো ক্ষুদে ক্ষুদে। বলে, 'ছেলেটা বেশিদিন বাঁচবে না।…'

'তুমি চুলোয় যাও!' ছেলেটি পাল্‌টা জবাব দেয়; খুশিভরা সুরেলা গলার স্বর।

'ছেলেটার জিভ কেটে ফেললে ঠিক হয়।' কুজিন মন্তব্য করে।

তার কথা শুনে আর্তেম চটে যায় :

'বটে! বরং তোমার জিভটাই উপড়ে নেওয়া উচিত। একেবারে গোড়াসুদ্ধ উপড়ে নেওয়া, বিটকেল কোথাকার!'

চুল্লির দিক থেকে কে যেন হুকুমের সুরে বলে ওঠে, 'আঁচ তুলে দিয়ে যাও হে!'

আর্তেম উঠে দাঁড়ায়, তারপর ধীরেসুস্থে পা বাড়ায় বাইরে বেরোবার দরজার দিকে। তার ছোট ভাইটি পিছন থেকে বারবার অনুযোগ করে :

'তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু নেই? খালি পায়েই বাইরে চলেছ? এক্ষুনি জুতো পায়ে দাও বলছি—নইলে ঠাণ্ডা লেগে মরবে যে!'

বুঝতে কষ্ট হয় না যে এ-ধরনের কথাবার্তায় সবাই অভ্যস্ত। এতে কেউ কিছু মনে করে না। হাসি-হাসি চোখে আর্তেম ভাইয়ের দিকে তাকায়, চোখ টেপে, তারপর ছেঁড়া বুটজোড়া পায়ে গলিয়ে নেয়।

মন খারাপ হয়ে যায় আমার। এই লোকগুলোর সঙ্গে আমি এতটুকু আত্মীয়তা বোধ করি না, ভারি একা মনে হতে থাকে নিজেকে—আর এই অনুভূতি বুকের ওপরে ভারী পাথরের মতো চেপে বসে। নোংরা জানলাটার ওপরে তুষারঝড় আছড়ে পড়ছে—বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা। এমনি ধরনের লোক আমি আগেও দেখেছি, এদের আমি কিছুটা বুঝতে পারি। আমি জানি, এদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই দিন কাটাচ্ছে এক মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে, এক অপরিহার্য আত্মিক সংকটের মধ্যে। গ্রামাঞ্চলের শান্ত পরিবেশে এরা জন্মেছে এবং বড়ো হয়েছে, এদের মনও সেইভাবে তৈরি। শহরে আসার পর মনের সেই কোমলতা ও মাধুর্য শ'য়ে শ'য়ে হাতুড়ির বাড়িতে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে, মনের সেই আদলটুকু পাল্‌টে গিয়ে কোথাও তা হচ্ছে আরো প্রশস্ত, কোথাও আরো সংকীর্ণ। শহরের নিজস্ব ছাঁচে ফেলে নতুন চেহারা দেওয়া হচ্ছে তাদের।

শহরের এই প্রক্রিয়ায় এক মুহূর্তও বিরতি নেই, নির্মমভাবে তা অগ্রসর হয়ে চলেছে। এটা বিশেষ করে চোখে পড়ে যখন এই স্থবির লোকগুলি হঠাৎ তাদের গাঁয়ের গান গাইতে শুরু করে। গানের শব্দ ও সুরের মধ্যে তারা ঢেলে দেয় নিজেদের আত্মার সমস্ত যন্ত্রণা ও বিহ্বলতা, সমস্ত বোবা উদ্বেগ।

ও-ওগো দীনা অভা-আ-গিনী কন্যে!

হঠাৎ উলানভ গান গেয়ে ওঠে; চড়া গলা, প্রায় মেয়েলি গলার স্বর। সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন পরের লাইনটা গেয়ে ওঠে; কিছুতেই যেন নিজেকে চেপে রাখতে পারে না।

নিশীথে ঘুরে বেড়াও মাঠে মাঠে···

'মাঠে মাঠে' শব্দটা গাওয়া হয় খুব আস্তে আস্তে, আর সেই শুনে আরো দু-তিনজন জেগে ওঠে। মাথাগুলোকে আরো নুইয়ে, মুখগুলোকে লুকিয়ে, তারাও নিজেদের ছেড়ে দেয় স্মৃতির কাছে।

মাঠে মাঠে ঝলকায় জোছনা
মাঠে মাঠে বয়ে চলে বাতাস···

গানের শেষ লাইন গাইবার আগেই ভানোক আবার কান্নাভরা গলায় গানের প্রথম লাইন গেয়ে ওঠে :

ও-ওগো দীনা অভা-আ-গিনী কন্যে

গলার স্বরগুলি আরো উচ্চগ্রামে ওঠে, আরো জোরালো হয় :

বাতাসকে কয় সে
ওগো সমীরণ
নাও আমার হৃদয়
নাও আমার আত্মা !

তারা গান গায় আর তখন মনে হতে থাকে যেন খোলা মাঠ থেকে মৃদু বাতাস কারখানা-ঘরের মধ্যে ঢুকে মানুষগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। এই বাতাস মানুষগুলোর মনে করুণা জাগিয়ে তোলে, হৃদয়কে করে তোলে কোমল ও মহৎ। তারপরেই হঠাৎ কেউ যেন এই দরদভরা গানের বিষণ্ণতায় লজ্জা পেয়ে যায় আর বিড়বিড় করে বলে :

'হায়, হায়, কী ঢলানী মেয়ে গো...'

গান গাওয়ার পরিশ্রমে উলানভের মুখটা লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। আরো জোর গলায়, আরো বিষণ্ণ সুরে সে গেয়ে ওঠে :

ও-গো দীনা অভা-আ-গিনী কন্যে...

গলার স্বরগুলো বিষণ্ণতায় ভেঙে পড়ে, এই বিষণ্ণতার যেন শেষ নেই। আর সেই বিষণ্ণ গান মানুষের মনকে নাড়া দেয় :

বাতাসকে কেঁদে মিনতি করে :
ওগো বাতাস নাও এই হৃদয়
নাও তাকে গহন গভীর বনে !

'ও মাগীকে আমার ভালোভাবে জানা আছে—'

গানকে ছাপিয়ে হঠাৎ শোনা যায় একটা নোংরা কুৎসিত ইঙ্গিত। খোলা মাঠের সুবাসকে তাড়িয়ে দেয় আস্তাকুঁড়ের পূতিগন্ধ।

'দুর, দুর ! চুলোয় যাক সব !'

ভানোক আর যাদের গলা সবচেয়ে ভালো তারা চেষ্টা করে গানের মধ্যে

আরো বেশি ডুবে যেতে। যেন তারা চেষ্টা করছে, এই পচা দুর্গন্ধের নীল শিখাকে আর দূষিত শব্দের ধোঁয়াকে গান দিয়ে মুছে দেবে। আর এই বিষণ্ণ প্রেমের কাহিনী মানুষগুলোকে আরো বেশি লজ্জা পাইয়ে দেয়। তারা জানে, শহরে প্রেম বিক্রি হয়, দশ কোপেক খরচ করলেই কিনতে পাওয়া যায় প্রেম। তারা কেনেও। প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রেমের ব্যাধি আর অভিশাপকেও কিনতে হয়। প্রেম সম্পর্কে তাদের নতুন করে কিছু চিন্তা করার নেই ; এ বিষয়ে তাদের মন পাকাপাকিভাবে তৈরি হয়ে গেছে।

ওগো দীনা অভাগিনী কন্ঠে
মোর তরে নেই ভালোবাসা

'হয়েছে গো, হয়েছে, আর ছেনালিপনা করতে হবে না···তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে গণ্ডায় গণ্ডায় পুরুষ তোমার প্রেমে পড়ে যাবে গো···'

আমার হৃদয়কে সমাধি দিও
শেকড় আর শরতের পাতায়···

'হারামজাদীরা জানে শুধু বিয়ে করতে। তারপরে পুরুষগুলোর ঘাড়ের ওপরে চেপে বসে থাকে···'

'ঠিক কথা···'

চমৎকার সব গান গায় উলানভ। গান গাইবার সময় ওর চোখের পাতা শক্তভাবে বুজে থাকে। মুখের চামড়া একাগ্রতায় কুঁচকে যায় ; বুড়োটে-পানা শ্লথ মুখটা রেখাঙ্কিত হয়ে ওঠে। সলজ্জ একটু হাসির আভা ফুটে ওঠে মুখের ওপরে।

কিন্তু জীবনের বীতশ্রদ্ধা থেকে উৎসারিত বিদ্রূপ মন্তব্যকে গান দিয়ে চাপা দেওয়া যায় না। বরং তার প্রকাশটা ঘন ঘনই হতে থাকে। আর রাস্তার কাদা যেমন ছুটির দিনের পোশাককে কলঙ্কিত করে দেয়, তেমনি এইসব বিদ্রূপ মন্তব্য দূষিত করে দেয় গানকে। ভানোককে স্বীকার করতেই হয় যে তার হার হয়েছে। ঘোলাটে চোখদুটো খুলে তাকায় সে, জীর্ণ মুখটা বেপরোয়া হাসিতে বেঁকে যায়, পাতলা ঠোঁটদুটোতে ফুটে ওঠে দুরভিসন্ধির রেখা। মূল গায়েন হিসেবে তার যে খ্যাতি আছে তা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে

সে উদগ্রীব। এমনিতে সে কুঁড়ে, তার সঙ্গীসাথীরা কেউ তাকে পছন্দ করে না, কিন্তু অন্তত এই একটা খ্যাতি তার আছে এবং এই খ্যাতিকে সে কিছুতেই ম্লান হতে দেবে না।

পাতলা পাতলা লাল চুল সমেত ত্রিভঙ্গ মাথাটা বেঁকিয়ে সে তারস্বরে চেঁচাতে থাকে :

হেথা থেকে দূরে
প্রলোমনি মোড়ে
থাকে এক ছাত্র
মদে অহোরাত্র
হয়ে থাকে চুর গো
হায় হায় হায় গো।

শ্বাস টেনে টেনে আর শিস দিতে দিতে গোটা কারখানার মানুষ সুরে সুর মিলিয়ে ফেটে পড়ে। জীবনের প্রতি তীব্র একটা বিতৃষ্ণা আর এক ধরনের হিংস্র আনন্দ নিয়ে অশ্লীল গান গায়।

হাসি নিয়ে মিথ্যে নিয়ে
ভুলিয়ে ছলাকলায়
ওগো তুমি স্বৈরিণী—

মনে হয় যেন সুন্দর একটা বাগানের বেড়া ভেঙে একপাল শুয়োর ঢুকেছে, মাড়িয়ে যাচ্ছে ফুলগুলোকে। কুটিল আর কুৎসিত হয়ে উঠেছে উলানভ; ঝলসে উঠেছে উদগ্র এক উত্তেজনায়। ছোপ্ ছোপ্ এলোমেলো দাগে ভরে গেছে বুড়োটে মুখটা, কোটর থেকে প্রায় ঠিকরে বেরিয়ে আসছে চোখদুটো, নির্লজ্জ অঙ্গভঙ্গিতে দুলে দুলে উঠছে শরীর। কর্কশ গলার স্বর হঠাৎ জোরালো হয়ে উঠেছে আর সেই গলার স্বর হিংস্র একটা কামনায় ফালা ফালা করে দিচ্ছে বুকের ভিতরটা :

ওগো তুমি বারবণিতা
ওগো তুমি ঘরের বৌ
এসো এসো এসো এসো।

হাতদুটো দোলাতে দোলাতে সে গেয়ে চলে, অন্তরা প্রচণ্ড একটা হুঙ্কার তুলে ফুঁসে ওঠে :

সুমুখপানে···হেইয়ো হো
সুমুখপানে !
সুমুখপানে···

থকথকে পুরু কাদা। টগবগ করে সেই কাদা ফুটছে। আর তারই মধ্যে জারিত হচ্ছে মানুষের আত্মা, শোনা যাচ্ছে কান্নায় প্রায় ভেঙে পড়া আত্মার বিলাপ। এই উন্মত্ততাকে সহ্য করা যায় না। এই দৃশ্য একটা অন্ধ প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলে. ইচ্ছে হয় দেওয়ালে মাথা ঠুকতে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাথা ঠোকা আর হয়ে ওঠে না, কখন সেই অশ্লীল গানের সঙ্গেই সুর মেলাতে হয়, হয়তো গলাও ওঠে অন্য সবাইকে ছাপিয়ে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সঙ্গীসাথীদের কথা ভেবে এক সর্বগ্রাসী করুণায় মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আর, তাছাড়া, নিজের উৎকর্ষকে উপলব্ধি করে খুশি হয়ে ওঠার মতো অবস্থা তো মানুষের সব সময়ে থাকে না!

মাঝে মাঝে নিঃশব্দে এসে হজির হয় মনিব কিংবা ছুটতে ছুটতে এসে ঢোকে লাল কোঁকড়ানো চুলওলা সাশ্‌কা।

'কী হে ছোকরার দল, ফুর্তি করা হচ্ছে বুঝি?' বিষভরা আধো-আধো মিষ্টি স্বরে জিজ্ঞেস করে সেমিয়োনভ। আর সাশ্‌কা এসেই তারস্বরে চিৎকার করে :

'ওরে বেজন্মারা, এত বেশি গোল করিসনে!'

কথাগুলোর মধ্যে স্পষ্ট একটা হুকুমের সুর থাকে। সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে যায় লোকগুলো। আগুনের যে শিখাটা জ্বলে উঠেছিল তা দপ্ করে নিভে যায় যেন। মানুষের আত্মার ওপরে আরো নিরন্ধ্র একটা অন্ধকার নেমে আসে।

একদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম :

'ভাইসব, ভালো ভালো গানগুলোকে তোমরা এভাবে নষ্ট কর কেন?'

উলানভ অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে : 'একথা বলছ কেন? আমরা কি খুব খারাপ ভাবে গান গাই?'

একথা শুনে অসিপ শাতুনভ বলে উঠল, 'গান আবার খারাপ ভাবে গাওয়া কি ? গান গানই, যেভাবেই গাও না কেন, তা নষ্ট হয় না। গান হচ্ছে মানুষের আত্মার মতো। আমরা সবাই মরব কিন্তু গান থেকে যাবে···চিরকালের জন্যে !'

চোখ নামিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে অসিপ কথা বলে। দেখে মনে হয় যেন কোনো ব্রহ্মচারিণী মঠের জন্যে চাঁদা তুলছে। আর যখন চুপ করে থাকে তখনো তার কালমুক্ ধরনের মুখের চওড়া চোয়ালদুটো অনবরত নড়ে, যেন এই ভারী চেহারার লোকটি সব সময়েই কিছু একটা চিবোচ্ছে···

কাঠের টুকরো জোড়া লাগিয়ে বই পড়বার একটা কাঠামো তৈরি করলাম। ময়দা মাখা হয়ে গেলে আমি যখন টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াই আর বিস্কুটের লেচিগুলোকে তুলে তুলে সাজিয়ে রাখি—তখন এই কাঠামোটাকে আমি বসাই ঠিক আমার সামনেটিতে। পৃষ্ঠা খোলা অবস্থায় একটা বই থাকে তার ওপরে, আর আমি জোরে জোরে পড়ি। ওদিকে আমার হাতের ফুরসৎ নেই, হাতের কাজ হাত করে চলেছে। পৃষ্ঠা উল্‌টে দেবার ভার নিয়েছে মিলোভ। কাজটা করতে গিয়ে তার চোখেমুখে বেশ একটা ভক্তির ভাব ফুটে ওঠে, শরীরটা অস্বাভাবিক রকমের টান হয়ে যায় আর হাতের আঙুলটা খুব ভালো করে ভিজিয়ে নেয়। আরেকটা কাজের ভারও তার ওপরে আছে। মনিবকে যদি কারখানা-ঘরের দিকে আসতে দেখা যায় তাহলে টেবিলের তলায় পা দিয়ে ঠেলে সে আমাকে সতর্ক করে দেবে।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল এই ভূতপূর্ব সৈনিকটির চোখকান মোটেই সজাগ নয়। একদিন আমি তলস্তয়ের 'তিন ভাইয়ের কাহিনী' পড়ছিলাম, এমন সময়ে শুনতে পেলাম ঠিক আমার কাঁধের ওপরে সেমিয়োনভ ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে নিশ্বাস ফেলছে। আমি আর সামলে উঠতে পারলাম না, তার আগেই বইটা হাতে নিয়ে সে চুল্লির আগুনের দিকে এগিয়ে যায় আর বলে :

'খুব বিদ্যে ফলানো হচ্ছে, না ? শয়তানির আর জায়গা···'

আমি ছুটে গিয়ে তার হাতটা শক্ত ভাবে চেপে ধরলাম :

'এ বই আপনি কিছুতেই আগুনে ফেলতে পারবেন না !'

'কে বলছে একথা ? এ্যাঁ ? কে বলছে ?'

'না, কিছুতেই আগুনে ফেলতে পারবেন না !'

কোথাও টুঁ শব্দটি নেই। দেখতে পাচ্ছিলাম, চোখমুখ ঘোঁচ করে পোড়ানী তাকিয়ে আছে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ঝকঝক করছে সাদা দাঁত। অপেক্ষা করতে লাগলাম, কখন সে চিৎকার করে ওঠে :

'ধরো গিয়ে !'

চোখের সামনে কতগুলি সবুজ চক্র পাক খেয়ে যাচ্ছে, পা কাঁপছে আমার। বিপুল বিক্রমে হাত চালাচ্ছে লোকগুলো ; যেন অন্য একটা কাজ শুরু করতে হবে বলে হাতের কাজ এক্ষুনি শেষ করে ফেলতে চায়।

'ফেলতে পারি না ?'

মালিক ফিরে প্রশ্ন করে। তার গলার স্বর শান্ত, আমার দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। মাথাটা একদিকে কাৎ করে আছে, যেন শোনবার চেষ্টা করছে কোনো কিছু।

'বইটা ফেরৎ দিন···এক্ষুনি !'

'আচ্ছা বেশ···নাও তোমার বই !'

দুমড়নো বইটা আমি নিলাম, তারপর ফিরে গেলাম নিজের জায়গায়। মাথা নিচু করে মনিব চলে গেল বাইরের উঠোনে, অভ্যাসমতো চেঁচামেচি না করেই। কারখানা-ঘরের মধ্যে বহুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলে না। এক সময়ে পোড়ানী বিশ্রীভাবে হাত নেড়ে নেড়ে কপালের ঘাম মোছে, তারপর মেঝেতে পা ঠুকে বলে :

'কপালে অনেক দুঃখ আছে, এই আমি বলে রাখলাম ! আমার তো মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ে···'

খুশিভরা স্বরে মিলোভ সায় দেয়, 'আমারও তাই মনে হচ্ছিল।'

আফসোসের সুরে জিপসি বলে ওঠে, 'আরেকটু হলে মারামারি শুরু হয়ে যেত !'

'ওহে বকবক-মহারাজ ! এবার থেকে বুঝেশুনে চলতে চেষ্টা করো ! হাড় বজ্জাত লোকটা, সহজে তোমাকে ছাড়বে না !'

পাকা চুলওলা মাথাটা নাড়তে নাড়তে কুজিন বিড়বিড় করে, 'বাপু হে, এটা তোমার জায়গা নয়। আর এতসব ঝামেলা আমরাও পছন্দ করি না! মনিবের মেজাজকে তুমি এভাবে খিঁচড়ে দেবে আর ঠ্যালা সামলাতে হবে আমাদের সবাইকে! কাউকে ও রেহাই দেবে না।'

ইয়াশ্‌কা আর্তিয়ুকভ সৈন্যটির দিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে হিসিয়ে ওঠে, 'নিথ্‌কম্মার ঢেঁকি! মনিব আথছে দেখতে পাও না?'

'তাই তো গো, দেখতে তো পেলাম না।'

'কেন, তোমাকে বলা হয়নি যে মনিব আথে কিনা নজর রাখবে?'

'তা তো হয়েছিল…কিন্তু ঠাহর করতে পারলাম না…'

বেশির ভাগ লোকই একটা অসন্তোষের ভাব নিয়ে মুখ বুজে রইল। কয়েকজন রাগে গজরাচ্ছে আর অন্যরা শুধু শুনছে। এরা আমাকে কী দৃষ্টিতে দেখছে তা বুঝে উঠতে পারছি না। অস্বস্তি বোধ করছি আমি। আমার পক্ষে বোধ হয় এ-জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়াই ভালো—এমনি একটা সিদ্ধান্ত করে বসি। আমার মনের চিন্তাটা খানিকটা যেন অনুমান করে নিতে পেরেই জিপসি রাগের সঙ্গে বলে ওঠে:

'ওহে বকবক-মহারাজ, আমার কথাটা শোন। তুমি বরং বলেই দাও যে তুমি এখানে কাজ করবে না। এখানে থাকলেই এবার থেকে তোমাকে নাকালের একশেষ হতে হবে! মনিব করবে কি, ইয়েগরকে লেলিয়ে দেবে তোমার দিকে— বাস, তাহলেই খতম!'

একটা মাদুরের ওপরে আসনপিঁড়ি হয়ে ইয়াশকা বসেছিল, ঠিক যেমন ভাবে দর্জিরা বসে থাকে। এবার সে উঠে দাঁড়িয়েছে, পেটটা ঠেলে বেরিয়েছে সামনের দিকে, কাঠির মতো সরু সরু পা-দুটোর ওপরে টলছে শরীরটা, দুধের মতো নীল চোখে আতঙ্কজনক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আর শূন্যে মুঠি পাকিয়ে চিৎকার করে বলছে:

'কেন শুনি?. কেন এখানকার কাজ ছাড়বে? বেটার চোয়ালে একটা ঘুষি লাগিয়ে দিলেই হয়! যদি রুখে দাঁড়ায় তো আমি তোমার দলে আছি!'

কথাটা শুনে এক মুহূর্ত কেউ কথা বলে না। তারপরেই মেষের রাজ্য

ফুঁড়ে হাসির দমক ফেটে পড়ে। তাজা ও প্রাণবন্ত হাসি—যা বৈশাখের বৃষ্টির মতো সমস্ত ধুলো আর ময়লা ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়, মানুষের আত্মাকে কলুষমুক্ত করে। তখন মানুষের আত্মা হয়ে ওঠে উজ্জ্বল আর পবিত্র, মানুষে মানুষে মিশে গিয়ে সৃষ্টি হয় একটি নিশ্ছিদ্র কাঠিন্য, একটি পরিপূর্ণ অবয়ব—পরস্পরের মন-জানাজানির বাঁধন দিয়ে এই অবয়বকে গেঁথে তোলা হয়।

ঘরের সবকটি মানুষ হাতের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। দু-হাতে পেট চেপে ধরে দুলে দুলে হাসছে সবাই। উচ্চকিত উচ্ছ্বসিত হাসি। হাসতে হাসতে জল বেরিয়ে আসছে চোখ থেকে। ইয়াশ্‌কাও হাসছে, তবে ওর হাসিটা একটু আড়ষ্ট। হাসছে আর গায়ের জামা ঝাড়ছে।

'কী, আমি পারি না নাকি? ব্যাটাকে আমি টের পাইয়ে দেব! একটা আধলা ইট বা চেলা কাঠ নিয়ে এ্যায়থা···'

শাতুনভ সবার আগে হাসি থামায়। হাতের তালু দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে কারও দিকে না তাকিয়ে সে বলে:

'এবারেও ইয়াশাই ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে! ঠিক কথাই বলেছে বাচ্চা। কেন বাপু, মিথ্যে একটা লোককে ভয় পাইয়ে দেওয়া। ও তো তোমাদের ভালোই করছিল—তার বদলে তোমরা কিনা ওকে এখান থেকে চলে যেতে বলছ···'

শরীরের দুলুনি বন্ধ করে পাশ্‌কা বলে, 'মনিবকে যে খানিকটা শাসানি দেওয়া গেছে—এটা ঠিক কাজই হয়েছে! আমরা তো আর কুকুর নই, না কি বলো?'

আর তারপরেই একটা উদ্‌গ্রীব আলোচনা শুরু হয়ে যায়। কি করলে আমাকে ইয়েগরের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে—এই হয় আলোচনার বিষয়বস্তু।

'ওর কি আর বোধশোধ আছে! মানুষকে খুন করা আর তাকে একেবারে ছুলো করে দেওয়া—ওর কাছে দুটোই এক ব্যাপার! কিছুমাত্র তফাৎ নেই!'

ইয়াশকার-ই সবচেয়ে বেশি উৎসাহ, ওর কাছে সবাই হার মানে। আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার নানা অদ্ভুত সব পরিকল্পনা রুদ্ধশ্বাসে বলে যেতে থাকে।

আর আগাগোড়া সময় দেওয়ালের একটা কোণের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বুড়ো কুজিন বিড়বিড় করে বলে চলে :

'তোদের বলতে বলতে আমি হার মানলাম। ঠাকুরের মূর্তিটাকে একটু পরিষ্কার করার কথা তো কতবার বলেছি···'

হাতের বেলচাটা দিয়ে উনুনের মধ্যে খোঁচা দিতে দিতে জিপসি নিজের মনেই বক্‌বক্ করে চলেছে :

'খানিকটা ঝামেলার জন্মে তৈরি থাকতে হবে বৈকি···এখানে বড়ো বেশি জবরদস্তি চলেছে···'

ভারী ভারী পা ফেলে কে যেন জানলার পাশ দিয়ে হেঁটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সবজান্তা ইয়াশকা উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে :

'ওই ইয়েগর চলেছে সদর বন্ধ করতে। শুয়োরের ছানাগুলোকে দেখা-শোনা করতে যাচ্ছে···'

কি যেন বিড়বিড় করে বলে, 'হাসপাতালে গিয়েও লোকটা বেঁচে ফিরে এল—কপাল!'

ঘরের আবহাওয়া নিস্তব্ধ ও ভারী হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ পরে পোড়ানী আমার কাছে প্রস্তাব করে, 'সেমিয়োনভের নাচুনি-কুঁদুনি দেখতে চাও নাকি?'

গলিতে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের একটা ফাটল দিয়ে আমি উঠোনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। উঠোনের ঠিক মাঝখানটিতে একটা বাক্‌সের ওপরে মনিব বসে আছে; খালি পা, লম্বা শার্টের কোঁচড়ে ডজন দুয়েক মিষ্টি রুটি। ইয়র্ক-শায়ার জাতের চারটে প্রকাণ্ড শুয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ তুলে তার পায়ের চারদিকে ঘুরঘুর করছে। শুয়োরগুলোর লাল চোয়ালের ফাঁকে মাঝে মাঝে সে এক একটা রুটি গুঁজে দিচ্ছে আর শুয়োরগুলোর লাল্‌চে পেটে আদর করে চাপড় মারছে। কথা বলছে অস্ফুট স্বরে; দরদভরা চাপা গলার স্বর—চেনা যায় না।

'আয়রে আয়,' আয়রে আমার পুষির দল...মিষ্টিরুটি খেতে চাস বুঝি? খা···খা···খা···'

থলথলে মুখটায় ফুটে উঠেছে স্বপ্নের ঘোর লাগানো নরম হাসি। কটা

চোখটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে ; প্রশ্রয়ের দৃষ্টি সেই চোখে। তাকে চেনা যাচ্ছে না ; একেবারে আনকোরা আর বেয়াড়া ধরনের নতুন একটা কিছু দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে। তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন লোক ; চওড়া কাঁধ, বসন্তের দাগওলা মুখ, মস্ত গোঁফ, পরিষ্কারভাবে কামানো নীল চিবুক। বাঁ কানে একটা রূপোর মাকড়ি পরেছে, মাথার টুপিটা পিছনদিকে ঠেলে দেওয়া। গোল গোল চোখদুটো বোতামের মতো, ঘোলাটে চাউনি। শুয়োরগুলো মনিবকে ঘিরে ছুটোপাটি লাগিয়েছে আর সেই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছে সে। হাতদুটো কোটের পকেটে ঢোকানো ; পকেটের মধ্যে হাতদুটো অনবরত নড়াচড়া করে জামার কিনারটা দলা পাকিয়ে চলেছে।

'এবার শুয়োরগুলোকে বিক্রি করে দিতে হবে।' মোটা মোটা হেঁড়ে গলায় সে বলে ; কথা বলতে গিয়ে ভোঁতা মুখটার একটা মাংসপেশীও নড়ে না।

চড়া গলায় মনিব ধমক দিয়ে ওঠে, 'এত তাড়া কিসের ? এগুলির জুড়ি পেতে ঢের দেরি…'

একটা শুয়োর তার শুঁড দিয়ে মনিবকে গুঁতো দেয়। বাক্‌সের ওপরে সেমিয়োনভের শরীরটা টলে ওঠে। শুয়োরটার কাণ্ড দেখে সেমিয়োনভ মহা খুশি। থলথলে বিপুল শরীরটা দুলিয়ে দুলিয়ে তখন সে কী অট্টহাসি তার। মুখের চামড়া এমন ভাবে কুঁচকে যায় যে বিসদৃশ চোখদুটো ঢাকা পড়ে চামড়ার ভাঁজে।

হাসির ফাঁকে ফাঁকে সে চিৎকার করে বলে, 'ত্থাখ ত্থাখ, ঝাপড় দাপড যোগী মহারাজদের ত্থাখ! আয়—আয়—চু—চু! থাকে তারা অন্ধকারে—অন্ধকারেই থাকে! ত্থাখ, ত্থাখ—একবারটি দেখে যা! ওরে আমার সোনার বাছারা …ওরে আমার পুণ্যিবানেরা …'

শুয়োরগুলোর চেহারার মধ্যে বিশ্রীরকমের মিল। আলাদা করে কোনোটাকেই চেনা যায় না। মনে হয়, একটা শুয়োরই চারটে হয়ে উঠোনময় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। এই সাদৃশ্যকে অসহ্য একটা তামাসার মতো মনে হয়। ক্ষুদে ক্ষুদে মাথা, বেঁটে বেঁটে পা, আদুড় পেটগুলো প্রায় মাটি ছুঁয়ে আছে। ছোট ছোট চোখগুলো কোনো কাজেই লাগে না, চোখের

পাতাগুলো কটা রঙের। ভীষণ রাগে চোখগুলোকে পিটপিট করতে করতে ঢুঁ মারছে লোকটিকে। আমার কাছে এই দৃশ্য ভয়ংকর একটা স্বপ্ন বলে মনে হতে থাকে।

কত রকমের আওয়াজ! ঘড় ঘড়, ঘোঁৎ ঘোঁৎ, চিঁ চিঁ! এমনি সব আওয়াজ তুলে ইয়র্কশায়ারী জন্তুগুলো খাবারের লোভে মনিবের কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে দিচ্ছে। মনিবের পায়ে গা ঘষছে। মনিবও মহা খুশি। এই এক হাত দিয়ে তাদের ঠেলে সরিয়ে দেয়, আবার অন্য হাতে একটা রুটি নিয়ে মুখের সামনে ধরে তাদের ক্ষেপিয়ে তোলে। রুটিসুদ্ধ হাতটা এক-একবার মুখের একেবারে সামনে নিয়ে আসে, পরক্ষণেই আবার চট করে সরিয়ে নিয়ে যায়। সারা শরীর কাঁপিয়ে আলতোভাবে হেসে হেসে ওঠে. তাকে দেখে মনে হয়, সে নিজেও জন্তুগুলোকেই প্রায় অনুকরণ করে চলেছে। তবে তফাৎ এইটুকু, জন্তুগুলোর তুলনায় সে আরো বেশি ভীতিজনক, আরো বেশি বিরক্তিকর—এবং আরো বেশি কৌতূহলোদ্দীপক।

আলস্যভরে মাথাটা তুলে ইয়েগর তাকায় আকাশের দিকে। শীতকালের আকাশ তার চোখেই মতোই ঘোলাটে। বহুক্ষণ ধরে সেই আকাশের দিকে সে তাকিয়ে থাকে। চকচকে পালিশ করা কানের মাকড়িটা দুলতে থাকে তার ঘাড়ের ওপরে।

অস্বাভাবিক চড়া গলায় হঠাৎ সে বলে ওঠে, 'হাসপাতালের নার্সের কাছে একটা কথা শুনেছিলাম। কথাটা আর কেউ জানে না। সে বলেছিল, চরম বিচারের দিন বলে কিছু নেই।'

একটা শুয়োরের কান বাগিয়ে ধরবার চেষ্টায় সেমিয়োনভ ব্যস্ত ছিল। সে প্রশ্ন করে:

'কিছু নেই?'

'না।'

'মেয়েটা ডাহা মিথ্যে বলেছে···'

'তা হতে পারে।'

বেয়াড়া স্বভাব শুয়োরগুলোর। মাজা ঘষা গা। মনিব তেমনিভাবে সে-

গুলোকে আদর করে চলে। কিন্তু তার হাতের নড়াচড়ায় ক্ষিপ্রতা নেই—হাতটা ভারী হয়ে আসছে। দেখে বোঝা যায়, সে ক্লান্ত।

'মেয়েটার বুকের গড়ন চমৎকার, চোখদুটো বড়ো বড়ো।' ইয়েগরের পুরনো কথা মনে পড়েছে ; দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলে।

'কার ? নার্সের ?'

'নইলে আর কে হবে ! ও বলে, চরম বিচারের দিন আসবে—সেটা ঠিক কথা নয়। তবে আগস্ট মাসে নাকি সূর্য একেবারে ঢাকা পড়ে যাবে…'

অবিশ্বাসের সুরে সেমিয়োনভ আবার প্রশ্ন করে :

'একেবারে ঢাকা পড়ে যাবে ? বলছ কি তুমি ?'

'হ্যাঁ, একেবারেই ঢাকা পড়বে। তবে ও আমাকে বলেছে, সেটা খুব বেশিক্ষণের জন্যে নয়। একটা ছায়া সূর্যের ওপর দিয়ে চলে যেতে যতোটুকু সময় লাগে…'

'ছায়া আসবে কোত্থেকে ?'

'তা জানি না। ভগবানের শরীর থেকে আসবে হয়তো …'

পায়ের ওপর ভর দিয়ে মনিব উঠে দাঁড়ায়, তারপর কঠোর স্বরে এবং জোরের সঙ্গে বলে :

'মেয়েটা একেবারে আস্ত বোকা ! সূর্যের গায়ে ছায়া পড়লেই হল ? সূর্যের সামনে কোনো ছায়াই টিকতে পারে না। যে কোনো ছায়াই পড়ুক না কেন, সূর্য এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে। এই হচ্ছে এক কথা। আর দ্বিতীয় কথা—সবাই জানে যে ভগবানের শরীর আলো দিয়ে তৈরি। তাই যদি হয় তাহলে তার শরীর থেকে ছায়া আসবে কোত্থেকে ? তাছাড়া আকাশের কথাই যদি বলো, সেটা শুধু শূন্য। যেখানে কোনো বস্তু নেই সেখানে ছায়াও নেই। বস্তু ছাড়া ছায়া দেখেছ কখনো ? মেয়েটা একেবারে আস্ত বোকা—যা খুশি তাই বলে…'

'তা তো হবেই…সব মেয়েই যা হয়ে থাকে…'

'ঠিক কথা…আচ্ছা, এবার শুয়োরগুলোকে খোঁয়াড়ে ঢোকাও।'

'ওদের একজনকে ডেকে নিয়ে আসি।'

'তা আনতে পার। কিন্তু খবরদার, ওরা যেন শুয়োরগুলোর গায়ে হাত না তোলে, তাহলে আর একটাকেও আস্ত রাখব না, এটা খেয়াল রেখো…'

'তা জানি।'

উঠোন পেরিয়ে মনিব এগিয়ে গেল। আর মাদী শুয়োরের পিছনে যেমন ছানাগুলো ছোটে তেমনি এই ইয়র্কশায়ারী জন্তুগুলোও ছুটল তার পিছনে পিছনে।

গলি থেকে কারখানা-ঘরে ঢুকতে একটা দরজা আছে। পরদিন খুব ভোরে দরজাটাকে হাট করে খুলে দিয়ে মনিব এসে দাঁড়াল এই দরজার চৌকাঠে। বিষমাখা মধুর স্বরে বলল :

'বকবক মহারাজ, একটা নিবেদন আছে! উঠোনে ময়দার বস্তা আছে, সেগুলোকে এই চালার ভিতরে নিয়ে আসতে হবে…'

খোলা দরজা দিয়ে সাদা মেঘের মতো ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা আসছে। বাতাসটা সরাসরি এসে লাগছে ফোটানী নিকিতার গায়ে। ঘাড় ফিরিয়ে মনিবের দিকে তাকিয়ে নিকিতা বলল, 'ভাসিলি সেমিয়োনিচ, দয়া করে দরজাটা বন্ধ করুন, বাতাসের বেশ জোর আছে।'

'কী বললে? বাতাসের জোর আছে?' সেমিয়োনভ খেঁকিয়ে ওঠে' তারপর হাতটাকে শক্ত করে মুঠো পাকিয়ে মাথায় একটা গাঁট্টা মেরে চলে যায়। দরজাটা খোলাই পড়ে থাকে।

নিকিতার বয়স বছর ত্রিশ। কিন্তু তাকে দেখে মনে হয় যেন একটি বুড়ো খোকা। ভীরু চেহারা, হলদেপানা মুখ। সারা মুখে ছোট ছোট লোমের গোছা আছে বটে কিন্তু রঙ বোঝা যায় না। বড়ো বড়ো চোখে সব সময়ে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকে; আতঙ্ক আর উদ্বেগ জমা হয়ে আছে চোখের চাউনিতে। গত ছ-বছর ধরে ভোর পাঁচটা থেকে সন্ধ্যে আটটা পর্যন্ত তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে এই ফুটন্ত কড়াইয়ের সামনে। ফুটন্ত জলে হাত ডোবাতে হয়েছে অনবরত। শরীরের একদিকটা ঝলসে গেছে আগুনে। তার ঠিক পিছন দিকেই গলিতে বেরোবার দরজা। সারা দিনে

কয়েক-শো বার সেই দরজা খোলা হয়, আর ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপ্‌টা এসে সিঁটিয়ে দিয়ে যায় তাকে। হাণ্ডের বাতজর্জর আঙুলগুলো বেঁকে গেছে, ফুসফুস ফুলে উঠেছে আর পায়ের নীল শিরাগুলো গিঁট-পড়া দড়ির মতো টান হয়ে উঠেছে।

একটা খালি থলে কাঁধে ফেলে উঠোনে যাবার জন্যে পা বাড়ালাম। নিকিতার কাছ-বরাবর যখন এসেছি, শুনতে পেলাম, দাঁতে দাঁত চেপে সে বিড়বিড় করে বলছে:

'নিজের দোষেই নিজে মরেছ···এবার টের পাও মজাটা···'

তার বড়ো বড়ো চোখদুটো থেকে নোংরা ঘামের মতো চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে।

আমি মুষড়ে পড়েছি। বাইরে যেতে যেতে ভাবি: আমাকে এখান থেকে সরে পড়তে হবে।

মেয়েদের মতো শেয়ালের লোমের কোট পরে মনিব দাঁড়িয়েছিল। পাশেই স্তূপীকৃত ময়দার বস্তা; শ' দেড়েক হবে। হাজার চেষ্টা করলেও এই দেড়শো বস্তার তিন ভাগের এক ভাগও চালার ভিতরে নিয়ে যাওয়া যাবে না। সে কথা তাকে বলতেই সে ভেঙচিয়ে ওঠে:

'তাহলেও তোমার নিস্তার নেই···বস্তাগুলোকে আবার তাহলে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে···ঠিক আছে, লেগে যাও, জোয়ান মদ্দ তুমি···'

কথাটা শুনেই আমি মাথা থেকে ধপ করে ময়দার বস্তাটা ফেলে দিলাম। তারপর সরাসরি তাকে বলে দিলাম, সে যেন আমার পিছনে না লাগতে আসে, আর এক্ষুনি যেন আমার মাইনে চুকিয়ে দেয়।

মুখ ভেঙচিয়ে সেমিয়োনভ ধমক দিয়ে ওঠে, 'হয়েছে, হয়েছে! এখন কাজে লেগে পড়ো দিকি! মাইনে চুকিয়ে দিলে শীতকালটায় কী উপায় হবে শুনি? না খেয়ে মরবে যে···'

'আমার মাইনে চুকিয়ে দিন!'

তার কটা চোখটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে, শয়তানিভরা সবুজ চোখটা

পাক খাচ্ছে। হাতটা মুঠি করে শূন্যে একটা ঘুষি ছুঁড়ে ভারী ভারী গলায় সে আমাকে জিজ্ঞেস করল :

'কী হে, চোয়ালে একটা ঘুষি খাবার ইচ্ছে হয়েছে বুঝি ?'

আমার মাথায় রক্ত উঠে এল। তার বাড়িয়ে-ধরা হাতটা এক ঘায়ে সরিয়ে দিয়ে আমি তার কান ধরলাম এবং একটিও কথা না বলে কান ধরে মোচড়াতে লাগলাম। বাঁ হাত দিয়ে আমার বুকে ঠেলা দিতে দিতে বিস্ময়ভরা চাপা স্বরে সে বলে উঠল :

'এই! থাম! থাম! করছ কি তুমি? মনিব খেয়াল নেই! ছেড়ে দাও আমাকে—মাথা খারাপ হল নাকি তোমার···'

তারপর এক-একবার সে ঘা-খাওয়া ডান হাতটা বাঁ হাত দিয়ে তুলে ধরে আর এক একবার ম'লে দেওয়া কানটায় হাত বুলোয়। খাপছাড়া দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। আর বিড়বিড় করে বলে :

'মালিকের সঙ্গে এই ব্যবহার! এ্যাঁ, মালিকের সঙ্গে? এত সাহস তোমার! এ্যাঁ? আমি···আমি পুলিসে খবর দেব!···আলবৎ দেব—'

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে ঠোঁটটা ছুঁচলো করে তোলে। একটা যন্ত্রণার ছাপ ফুটে ওঠে মুখের ওপরে। একটানা বিষণ্ণ সুরে শিস দেয়। তারপর ডান চোখটা পিটপিট করতে করতে স্থানত্যাগ করে।

খড়ের আগুনের মতো আমার রাগ যেমনি দপ করে জ্বলে উঠেছিল আবার তেমনি দপ করে নিভে গেল। লোকটিকে এখন দেখাচ্ছে অনেকটা সঙের মতো। থপ থপ করে পা ফেলে চলে যাচ্ছে সে ; আর চোট লাগলে যেমন হয়, ঠিক তেমনিভাবে খাটো ফারের জামার নিচে তার মোটা পাছাটা দুলছে।

বেশ ঠাণ্ডা। কারখানা-ঘরের ভিতরে ঢুকবার ইচ্ছে নেই আমার। ঠিক করলাম, শরীরটাকে গরম করবার জন্যে ময়দার বস্তাগুলোকে টেনে টেনে চালার ভিতরে নিয়ে যাব। প্রথম বস্তাটা নিয়ে চালার ভিতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল, দেওয়ালের একটা ফাটলে চোখ পেতে উবু হয়ে বসে শাতুনভ প্যাঁচার মতো তাকিয়ে আছে। খাড়া খাড়া চুলগুলো গাছের বাকলের ফিতে দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। ফিতের দুই প্রান্ত ঝুলে আছে

কপালের ওপরে আর ভুরুর সঙ্গে সঙ্গে নড়ছে।

সরু লম্বা চোয়ালটা ভীষণভাবে নাড়তে নাড়তে শান্ত স্বরে সে বলে, 'তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে ফেলেছি।'

'দেখে ফেলেছ তো কী হয়েছে?'

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সে। তার মঙ্গোলীয় ধরনের চোখদুটো বড়ো বড়ো হয়ে ওঠে। কেমন অস্বস্তি বোধ হয় সেই দৃষ্টির সামনে।

উঠে দাঁড়িয়ে আমার কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে সে বলে, 'শোন, তোমাকে একটা কথা বলি! এই ঘটনার কথা আমিও কাউকে বলব না, তুমিও কাউকে বোলো না...'

'আমি তো বলতে চাই না।'

'ঠিক কথা! হাজার হোক সে হচ্ছে আমাদের মনিব! নয় কি?'

'কী বলতে চাও তুমি?'

'একজন কেউ থাকা দরকার যার হুকুম আমরা মেনে চলব! নইলে নিজেদের মধ্যেই মারামারি কাটাকাটি শুরু হযে যাবে!'

প্রায় ফিসফিস করে খুব চাপা স্বরে সে কথা বলে। ভঙ্গিটা এমন যেন খুব জরুরি একটা কিছু কথা বলছে।

'খানিকটা শ্রদ্ধাভক্তি থাকা চাই তো, না কি বলো...'

ও যে কী বলতে চাইছে, তা আমার কাছে বোধগম্য নয়। আমি রেগে উঠি।

'তুমি চুলোয় যাও...'

শাতুনভ আমার হাত চেপে ধরে। রহস্যভরা চাপা স্বরে মন ভেজানোর মতো করে কথা বলে সে:

'ইয়েগরকে ভয় করবার কিছু নেই। আচ্ছা, তোমার এমন কোনো মন্ত্র জানা আছে যাতে রাত্রিবেলা ভয় পেতে না হয়? রাত হলেই ইয়েগরের মনে নানা আতঙ্ক এসে বাসা বাঁধে, সে কিছুতেই স্থির থাকতে পারে না, ভয় পায় যে সে এক্ষুনি হয়তো মরে যাবে। ওর মনের মধ্যে পাপ আছে... একদিন রাত্রে আমি আস্তাবলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি ইয়েগর

হাঁটু মুড়ে বসে আর্তস্বরে চিৎকার করছে—মাগো, জগজ্জননী, আমাকে বাঁচিও মা, আমার যেন অপঘাত মিত্যু না হয়! বুঝলে তো?'

'না, বুঝলাম না।'

'ইয়েগরকে শায়েস্তা করবার রাস্তা হচ্ছে এই!'

'তার মানে?'

'তার মানে, ইয়েগরকে শায়েস্তা করতে হবে ভয় দেখিয়ে···জোর ফলাতে যেও না···ওর গায়ে তোমার চেয়ে পাঁচগুণ বেশি জোর।'

আমি বুঝতে পারলাম যে এই লোকটি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিই। একটুখানি ইতস্তত করে সেও হাত বাড়ায়। সেই কড়া-পড়া হাতটা চেপে ধরি। আফসোসের ভঙ্গিতে সে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে, চোখ নামিয়ে মাটির দিকে তাকায় আর বিড়বিড় করে কি যেন বলে।

'কী বলছ?'

'আমার কথায় এখন আর কান দিও না।' আফসোসের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে সে কারখানাঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। আমি ময়দার বস্তাগুলোকে টেনে টেনে নিয়ে যেতে থাকি। আর এইমাত্র যা সব কাণ্ড ঘটে গেল তাই নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করি।

রুশদেশের মানুষের কথা আমি বইয়ে পড়েছি। বই পড়ে আমি জানি, রুশ মানুষের বন্ধুত্ব কী, অপরকে সে কি ভাবে আপন করে নেয়, তার উষ্ণ ও উদার মন কত সহজেই না ভালোর দিকে ঝুঁকে পড়ে! কিন্তু এইসব মানুষকে আমি আরো ভালোভাবে জানতে পেরেছি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। এই অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে কারণ দশ বছর বয়স থেকে আমি স্কুল ও বাড়ি ছেড়েছি এবং তারপর বাধ্য হয়ে আমাকে নিজের সংস্থান নিজেকেই করে নিতে হয়েছে।

আমার মনে হয়েছে, আমি বই পড়ে যা জেনেছি তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রায় সব জায়গাতেই চমৎকার মিল। হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই যে মানুষ ভালোর দিকেই আকৃষ্ট হয়, ভালোকে তারা তারিফ করে, ভালোকে পাবার জন্তে তারা লালায়িত। আর সব সময়ে

অপেক্ষা করে, যেখান থেকেই হোক ভালো আসবে তাদের কাছে আর তাদের এই বিপর্যস্ত ও বিষণ্ণ জীবনে নিয়ে আসবে আরেকটু উজ্জ্বলতা ও উত্তাপ।

আর এই চিন্তাটা ক্রমেই আমাকে পেয়ে বসে। ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন রূপকথার গল্প ভালোবাসে, রূপকথার গল্পের সৌন্দর্য ও অভিনবত্ব যেমন তাদের মুগ্ধ করে, রূপকথার গল্পের মধ্যে যেমন তারা ছুটির দিনের আস্বাদ পায়—তেমনি অধিকাংশ মানুষ ভালোকে ভালোবাসে। তবে ভালোর শক্তিতে এদের বিশ্বাস নেই। আর খুব কম লোকেরই এই বোধটুকু আছে যে ভালোকে বড়ো করে তুলতে হলে সযত্নে আগলে রাখতে হয়। এদের মনগুলো আসলে হচ্ছে পতিত জমি, সেখানে পুরু হয়ে প্রচুর আগাছা জন্মেছে। আর যদি ঘটনাচক্রে একদানা গমের বীজ এসে পড়েও, তাহলে শীষ গজাতে না গজাতেই ফসল শুকিয়ে ঝরে যায়।

শাতুনভকে দেখে আমার কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে—এই লোকটির মধ্যে এমন কিছু আছে যা সচরাচর অন্য মানুষের মধ্যে দেখা যায় না।

তারপর সপ্তাহখানেক মনিব আর কারখানা-ঘরের দিকেই এল না। আমাকে বরখাস্ত করার ব্যাপারেও কোনো উচ্চবাচ্য নেই। অবশ্য আমিও ব্যাপারটাকে খুঁচিয়ে তুলতে চাই না। আমার আর কোথাও যাবার জায়গা নেই আর এখানকার জীবন আমার কাছে উত্তরোত্তর কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে উঠছে।

স্পষ্টই বোঝা যায় যে শাতুনভ আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। আমি যতোই চেষ্টা করি না কেন যে ওর সঙ্গে 'দিলখোলা' হয়ে মিশব—কিন্তু কোনো ফল হয় না। হাজারটা প্রশ্ন করলে একটার জবাব পাওয়া যায়। তাও ভাসা-ভাসা। কথা বলে মাটির দিকে তাকিয়ে, আমতা আমতা করে :

'অবিশ্যি ঠিক কথাটা সবাই ধরতে পারে না! তবুও মানুষের আত্মা তার নিজের…'

এই লোকটির মধ্যে একটা কিছু আছে যা গভীর একটা অন্ধকার সৃষ্টি করেছে। খানিকটা যেন নিঃসঙ্গতা। খুব কম কথা বলা ওর স্বভাব। অশ্লীল

ভাষা ব্যবহার করে না কখনো। শুতে যাবার সময়ে বা ঘুম থেকে উঠে প্রার্থনা করে না; শুধু দুপুরে এবং রাত্রে খেতে বসার আগে চ্যাটালো বুকটার ওপরে নিঃশব্দে একবার ক্রুশচিহ্ন আঁকে। হাতে কোনো কাজ না থাকলে অলক্ষ্যে গিয়ে বসে থাকে কোনো একট ঘুপচিতে। এমন একটা জায়গা বেছে নেয় যা নাকি সবচেয়ে অন্ধকার। সেখানে বসে বসে জামা সেলাই করে বা পরনের শার্টটা খুলে নিয়ে অন্ধকারেই বসে বসে উকুন মারে। আর সব সময়েই গুন গুন করে গান গায়। গলার স্বর গভীর খাদের—প্রায় নিচু পর্দার অষ্টম সুরের। আর গানগুলো ভারি অদ্ভুত; সচরাচর শোনা যায় না।

কেন হায় আজি এই দিন
এত ম্লান এত অকরুণ

ওর এই গান শুনে কেউ হয়তো রসিকতা করে:

'শুধু আজই? তার মানে গতকালটা ভালোই কেটেছে?'

এ কথার জবাব না দিয়ে বা মুখ তুলে না তাকিয়ে সে গুন গুন করে গেয়ে চলে:

ইচ্ছে হলে পারি খেতে
ঘরে চোলাই মদ গো
কিন্তু হায় ইচ্ছে নেই···

'সে কি হে? মদ পাবে কোথায়? মানে বাড়িতে তৈরি মদের কথা বলছি।'

ওর চোখের পলক পড়ে না পর্যন্ত। মনে হয় কোনো কথা ওর কানে ঢুকছে না। তেমনি বিষণ্ণ সুরে গেয়ে চলে:

মনের মানুষ দেখে আসি ইচ্ছে বড়ো হয়
(কিন্তু) আমার পা রাজি নয় যেতে একেবারেই নয়
বুকের মাঝেও নেইকো হায় এতটুকু টান···

গান যদি ফুর্তির গান না হয় তাহলে তা পাশ্‌কা জিপ্‌সির পছন্দ নয়। রাগে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে:

'ওহে নেকড়ে! আবার বুঝি খেঁকানি শুরু হয়েছে?'

অন্ধকার কোণ থেকে গানের শেষ কথাগুলো গুড়ি মেরে মেরে একটির পর একটি বেরিয়ে আসে :

আমার বুকের মাঝে বিষাদ শুধু বিষাদ
খা খা বুক ক্লান্তিঠাসা নেইকো ঘুমের লেশ···

পোড়ানী হুকুম দেয়, 'ওহে ভানোক্, লোকটার গানকে চাপা দাও! নইলে ওর গানের চোটেই এই ঘরটা ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাবে! এস, একটু 'অজ-নৃত্য' শুরু করা যাক।'

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় উদ্দাম গান আর নাচ। শাতুনভ বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করে না, গাল ফুলিয়ে ফুলিয়ে পুরোদমে শব্দ বার করতে থাকে। নির্লজ্জ রকমের অশ্লীল সেই গান, কিন্তু তা সত্ত্বেও শাতুনভ অদ্ভুতভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। মাঝে মাঝে ওর গলার স্বরে গানটা ডুবে যায়—যেমন নাকি পুকুরের স্থির ঘোলাটে জলের গভীরতায় মিলিয়ে যায় নালার স্রোত।

আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করার মতো। পোড়ানী ও আর্তেম সদয় হয়ে উঠেছে আমার ওপরে। ওদের এই মনোভাবটা নতুন, আর খোলাখুলি ওরা কিছু বলে না। কিন্তু তবুও আমি বুঝতে পারি। আর ইয়াশ্‌কা 'ঝুমঝুম' তো কাণ্ডই করে বসল। যেদিন মনিবের সঙ্গে আমার ঠোকাঠুকি লাগে সেদিন রাত্রেই সে করে কি, আমি যে-কোণটায় শুই সেখানে টানতে টানতে একটা খড়ভর্তি থলে নিয়ে এসে ঘোষণা করে :

'থুনে রাখ, আজ থেকে তোমার পাথে আমি থোব!'

'আচ্ছা শোও।'

'তুমি আমার থঙ্গে ভাব করবে তো?'

'করব।'

সঙ্গে সঙ্গে গড়াতে গড়াতে আমার বিছানায় চলে আসে। গোপন কথা বলার মতো ফিসফিস করে বলে :

'আচ্ছা ইঁদুর কি আরথোলা খায়?'

'না, খায় না। একথা কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'আমি ভেবেছিলাম, ইঁদুর আরথোলা খায়!'

তারপর তেমনি তেমনি চাপা স্বরে নিজের গোপন কথাটা বলে ফেলে আমার কাছে। কথার সঙ্গে সঙ্গে নড়াচড়া করে পুরু জিভ, চকচক করে দুষ্টুমিভরা চোখ। বলে:

'জান, আমি একদিন দেখলাম যে একটা ইঁদুর একটা আরথোলার থঙ্গে কথা বলছে। এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, থত্যি থত্যি তাই দেখলাম। একদিন রাত্রে আমি জেগে উঠেছিলাম। দেখলাম, আমার কাছেই একটা ইঁদুর কুটুর কুটুর করে বিথ্কুট খাচ্ছে। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে আমিও চুপচাপ এগিয়ে গেলাম। আর ঠিক সেই থময়ে এল একটা আরথোলা। তারপর আরো দুটো আরথোলা। তখন মুখ থেকে বিথ্কুটটা ফেলে দিয়ে ইঁদুর গোঁফ নাচাতে লাগল। তা দেখে আরথোলারাও গোঁফ নাচাতে লাগল। আমাদের বোবা নিকান্দের যেমনভাবে গোঁফ নাচায় ঠিক তেমনিভাবে। এমনিভাবে ইঁদুর আর আরথোলারা কথা বলতে লাগল··· কী কথা হচ্ছিল ওদের মধ্যে তা আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। নিথ্চই খুব মজার মজার কথা—না? তোমার কি ঘুম পাচ্ছে?'

'না! থেমো না, বলে যাও···'

'ইঁদুরকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন আরথোলাদের জিজ্ঞেস করছে, 'তোমরা কোত্থেকে এথেছ?' আরথোলারা বলে, 'আমরা গাঁ থেকে এথেছি···' জান তো, গাঁয়ের লোক যদি খেতে না পায় বা আগুন লেগে গাঁ যদি পুড়ে গিয়ে থাকে তাহলেই গাঁয়ের থবাই দলে দলে থহরে আথতে থুরু করে···ঘরে আগুন লাগলে ওরা ছুটে পালিয়ে যায়। আগুন লাগার খবর আগে থেকেই পেয়ে যায় ওরা। মোড়ল এথে ওদের বলে, কোথায় গেলে থব, পালাও পালাও। বাথ্, থঙ্গে থঙ্গে থবাই ছুট ছুট। আচ্ছা, তুমি কখনো মোড়লকে দেখেছ?'

'না, এখনো দেখিনি···'

'আমি দেখেছি···'

এই পর্যন্ত বলার পরেই হঠাৎ ওর নাক ডাকতে শুরু করে—মনে হয় যেন

হাঁ করে করে নিশ্বাস নিতে চাইছে। ভোর পর্যন্ত ওর গলা আর শোনা যায় না!

তারপর থেকে প্রায় রোজই কারখানা-ঘরে মনিবের আবির্ভাব হতে লাগল। এটা তার কাছে একটা নিয়মের মতো হয়ে উঠেছে। আর মনে হল, ইচ্ছে করেই এমন একটা সময়ে সে আসে যখন আমি কারখানার মজুরদের কাছে কিছু একটা বলতে শুরু করেছি, বা কোনো একটা বই থেকে পড়ে শোনাচ্ছি। নিঃশব্দে ঘরে ঢোকে সে, তারপর আমার বাঁ দিকের জানলার ধারে কোণায় একটা বাক্সের ওপরে চুপচাপ বসে থাকে। তাকে দেখে আমি যদি চুপ করে যাই তাহলে সে গুরুগম্ভীর ঠাট্টার সুরে বলে ওঠে:

'গুরুমশাইয়ের থামা হল কেন, চলুক চলুক! ভয় কি, সুতোকাটা চলুক না!'

তারপর অনেকক্ষণ তেমনিভাবেই বসে থাকে। আর কোনো কথা বলে না, গাল ফুলিয়ে ফুলিয়ে ফু-ফু শব্দ করে। মাথায় চুল প্রায় নেই; তাছাড়া, চুলগুলো মাথার খুলির সঙ্গে এমনভাবে মিশে আছে যে প্রায় চোখে পড়ে না। চুলের নিচেই ছোট ছোট দুটো কান; গাল ফুলোলেই এই কানদুটোও নড়ে। মাঝে মাঝে কর্কশ ভাঙা গলায় বলে ওঠে:

'কী? কী বললে?'

একদিন আমি বর্ণনা করছিলাম বিশ্বের গড়ন; শুনতে শুনতে চেরা গলায় সে চিৎকার করে উঠল:

'থাম! থাম! এর মধ্যে ভগবান কোথায়?'

'এই তো ভগবান···'

'মিথ্যে কথা! কোথায় তিনি?'

'বাইবেলের কথা মনে আছে?'

'যা-তা বলে আমাকে বুঝ্ দেবে তেমন বোকা আমি নই! কোথায় তিনি?'

'এবং পৃথিবী ছিল আকারহীন—অন্ধকারাচ্ছন্ন অখণ্ড শূন্য ! এবং ঈশ্বরের আত্মা জলরাশির উপরে সঞ্চরমান···'

বিজয়-উল্লাসে সে চিৎকার করে উঠল, 'জলরাশি ! আর এতক্ষণ তুমি বলছিলে আগুনের কথা ! রোসো, আমি পাদরিমশাইকে জিজ্ঞেস করব, শাস্ত্রে কি লেখা আছে···'

এই বলে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। তারপর ঘরের বাইরে যেতে যেতে বিরস কণ্ঠে বলল ঃ

'বকবক মহারাজ, তুমি তো দেখছি অনেক কিছুই জানশোন ! তুমি কি মনে কর, এতে তোমার কিছু ভালো হবে ?···'

মনিব বাইরে চলে যাবার পরে মাথা ঝাঁকিয়ে পাশ্‌কা বলে উঠল :

'দেখে নিও, ও তোমাকে ঠিক ফাঁদে ফেলবে !'

এই ঘটনার দুদিন পরে সাশ্‌কা কেরানি ছুটতে ছুটতে এল কারখানা-ঘরে, তারপর ঝাঁজালো স্বরে আমাকে বলল, 'যাও, মনিব তোমায় ডাকছে !'

খাঁদা নাক আর ফুট ফুট দাগওলা মুখটা তুলে 'ঝুমঝুম' গম্ভীরভাবে পরামর্শ দিল :

'মুগুরটা সঙ্গে নিয়ে যেও !'

চাপা হাসি উঠল ঘরের মধ্যে। আমি বেরিয়ে এলাম।

আধা নিচুতলার ঠাসাঠাসি একটা ঘর। সামোভারের সামনে একটা টেবিল ঘিরে বসে আছে আমার মনিব ; আর দনোভ ও কুভশিনোভ নামে বিস্কুট কারখানার দু'জন কারিগর। ঘরের দরজার সামনে এসে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। বিষভরা নরম স্বরে মনিব বলল ঃ

'এই যে গুরুমশাই বকবক-মহারাজ, দয়া করে আমাদের কাছে সূর্য ও তারার কথা বলুন। কি করে সব ব্যাপার স্যাপার ঘটেছে তা শোনা যাক !'

তার মুখটা টকটকে হয়ে উঠেছে। কটা চোখটা ধারালো, আর সবুজ চোখে শয়তানির ঝিলিক। তার পাশেই জ্বলজ্বল করছে আরো দুটি হাসি হাসি চেহারা। একটি—গাজরজাতীয় মূলের ঘের দেওয়া গলদা চিংড়ির মতো লাল ; অপরটি—ময়লা আর ছাতা-ধরে-যাওয়ার-মতো মানচিত্র। সামোভার থেকে মন্থর

গোঙানি উঠছে আর বাষ্পের ঝলকে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে উদ্ভট চেহারার মাথাগুলো। দেওয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে একটা চওড়া বিছানা পাতা; বিছানার ওপরে বসে আছে মনিবের উপপত্নী। দেখে মনে হয় যেন একটা পাঁশুটে রঙের বুড়ো বাদুড়। ঘোঁচ হয়ে যাওয়া বিছানার চাদরের ওপর এলিয়ে দিয়েছে হাতদুটো, ঝুলে পড়েছে তলার ঠোঁট। শরীরটা দুলছে আর সশব্দে হিক্কা তুলছে। এক কোণে ঠাকুরের আসন; নিঃসঙ্গ একটা প্রদীপের হলুদে শিখা দপ্‌ দপ্‌ করছে; শীতের কাঁপুনি ধরেছে মনে হয়। দুই জানলার মাঝখানের দেওয়ালে ঝুলছে কোমর-পর্যন্ত-উলঙ্গ একটি স্ত্রীলোকের তেলরঙে ছাপা ছবি; স্ত্রীলোকটি কোলের ওপরে একটা বেড়াল বসিয়ে রেখেছে; সে নিজেও যেমন বিশ্রী রকমের মোটা, বেড়ালটাও তাই। ভদ্‌কা, ব্যাঙের ছাতার চাটনি আর ভাপে সেদ্ধ মাছের গুমোট একটা গন্ধে ভরে আছে ঘরটা। পথচারীদের পাগুলো জানলার সামনে দিয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছে, যেন মস্ত এক একটা কাঁচি, নিঃশব্দে কোনো কিছুকে কাটছে।

আমি এগিয়ে যেতেই আমার মনিব টেবিলের ওপর থেকে একটা কাঁটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর টেবিলের ওপরে সেই কাঁটা দিয়ে ঠুকতে ঠুকতে বলল:

'বাস্‌, বাস্‌, যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক···আগে তোমার গল্পটা শোনা যাক; তারপর দেখা যাবে তোমাকে আদর-আপ্যায়ন করা যায় কিনা···'

আমি ঠিক করলাম যে সবশেষে আমার দিক থেকেও আপ্যায়নের ত্রুটি রাখব না। তারপর বলতে শুরু করলাম।

এই পৃথিবীর জীবনে সুখ বলতে এমন কিছু নেই, সুতরাং আকাশটাকেই আমি এতবেশি পছন্দ করি। গ্রীষ্মের রাত্রে প্রায়ই আমি বেরিয়ে চলে যাই বাইরের মাঠে আর আকাশের দিকে মুখ করে মাটির ওপরে শুয়ে পড়ি। আর তখন মনে হতে থাকে, আকাশের প্রত্যেকটি তারা থেকে আমার শরীরে ও মনে সোনালী আলো ঝরে পড়ছে, সেই অংসখ্য ধারাপথে অসীম মহাশূন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছি আমি, মস্ত একটা

বীণাযন্ত্রের তারে তারে ভেসে বেড়ানোর মতো আমিও পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রলোকে ভেসে বেড়াচ্ছি। নৈশ পৃথিবীর জীবন শান্ত গুঞ্জন তুলে বয়ে যাচ্ছে আর গান গেয়ে উঠছে; বেঁচে থাকার অপরিশেষ আনন্দের গান। প্রাণসম্পদে ভরা এই কয়েকটি ঘণ্টা বিশ্বের সঙ্গে আমার আত্মার যোগাযোগ স্থাপন করে আর আশ্চর্য এক প্রক্রিয়ায় আমার মন থেকে সারা দিনের অনেক বিক্ষোভের কালিমা ধুয়েমুছে নেয়।

আর এখন এই ছোট্ট নোংরা ঘরে তিনজন মনিবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি আমি, আর এক মাতাল ডাইনী চোখের পাতা পিটপিট করতে করতে নির্বোধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তবুও কথা বলতে বলতে এই বিরক্তিকর পারিপার্শ্বিকের কথা ভুলে গেলাম একেবারে, আত্মহারা হয়ে বলতে লাগলাম। আমি দেখতে পাচ্ছি, দুটো কুৎসিত মুখ আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে; আমার মনিব ঠোঁটদুটোকে ছুঁচলো করে শিস দিয়ে চলেছে আলতোভাবে—তার সবুজ চোখটা সর্বক্ষণ দ্রুত চলাফেরা করছে আমার মুখের ওপরে; অদ্ভুত একটা চাউনি, খুঁটিয়ে বিচার না করে কিছুতেই যেন থামবে না। শুনতে পেলাম ক্লান্ত ভারী গলায় দনোভ বলছে:

'দূর ছাই! ছোঁড়াটা দেখছি কথা বলে বলে মাথার পোকা বার করে দিতে পারে!'

সঙ্গে সঙ্গে কুভশিনভ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে মন্তব্য জুড়ে দেয়:

'আমার কথা যদি শুনতে চাও, আমার তো মনে হয় ছোঁড়াটার মাথায় ছিট্ আছে!'

এই কথা শুনে আমি দমে যাইনি। আমি চাইছিলাম যে ওরা আমার কথা শুনুক। আর আমার মনে হতে থাকে যে আমার কথা ক্রমে ওদের আচ্ছন্ন করে ফেলছে···

হঠাৎ আমার মনিব একটুও নড়াচড়া না করে চড়া নাকি সুরে আস্তে আস্তে বলল:

'ঠিক আছে বকবক মহারাজ, এতেই চলবে! সাবাস! চমৎকার

বলেছ! যাইহোক এতক্ষণ তো আকাশের তারাগুলোর যা-হোক একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছ, এবার যাও তো শুয়োরের ছানাগুলোকে, আমার সোনামণিদের, খাইয়ে এস…'

এখন এসব ঘটনা ভাবতে মজা লাগে। কিন্তু সে-সময়ে আর যাই হোক মাজা পাইনি। প্রচণ্ড রাগে আমি দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও কি করে যে নিজেকে আমি সংযত রাখতে পেরেছিলাম তা আজ আর আমার মনে নেই।

মনে আছে, ছুটে গিয়ে কারখানা-ঘরে ঢুকতেই শাতুনভ ও আর্তেম আমাকে ধরে ফেলে। হাত ধরে ভিতর দিকে নিয়ে গিয়ে জল খেতে দেয়। একগ্লাস জল খেয়ে আমি সামলে উঠি। ইয়াশ্কা ঝুমঝুম মুরুব্বির মতো বলে :

'কেমন? আমি বলিনি? তখন তো আমার কথা শুনলে না!'

আর জিপ্সি তো রাগে ভুরু কুঁচকে বিড়বিড করে চলেছে। আমার পিঠ চাপড়িয়ে দিয়ে বলে :

'আমি হলে ওই লোকটার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতাম না…ও একবার যদি কারও ওপরে চটে যায় তাহলে তার আর রক্ষে নেই…খোদ বিশপ হলেও না…'

শুয়োরের পালকে খেতে দেওয়ার কাজকে মনে করা হয় খুব একটা ছোট কাজ; খুব কড়া রকমের শাস্তি দেবার ইচ্ছে না থাকলে কাউকে এই কাজ করতে বলা হয় না। ইয়র্কশায়ারী জন্তুগুলোকে রাখা হয়েছিল একটা অন্ধকার আর ঘিঞ্জি খোঁয়াড়ে। খাবারের বালতি নিয়ে ভিতরে ঢুকলেই জন্তুগুলো ছুটে এসে এমন ধাক্কা লাগায় যে টাল সামলানো যায় না আর ভোঁতা নাকগুলো দিয়ে অনবরত ঢুঁ মেরে চলে। ওদের এই রুক্ষ আপ্যায়নের ঠেলায় পড়ে যাকে কাদায় গড়াগড়ি দিতে হয় না তার খুবই বরাত বলতে হবে।

খোঁয়াড়ে ঢুকেই কালবিলম্ব না করে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় আর লাথি মেরে মেরে সরিয়ে দিতে হয় শুয়োরগুলোকে। লাথি মারলে রেগে গিয়ে এই জন্তুগুলোর কামড়ে দেবার অভ্যেস আছে সুতরাং বালতির তরল খাদ্যবস্তুকে ডাব্নার মধ্যে ঢেলে দিয়েই পালিয়ে আসতে হয় সঙ্গে সঙ্গে।

আর এর চেয়েও খারাপ অবস্থায় পড়তে হয় যখন ইয়েগর কারখানা-ঘরের ভিতরে ঢুকে ক্যান্‌কেনে গলায় ঘোষণা করে :

'ওহে কাৎসাপি *, চলে এস, শুয়োরগুলোকে খোঁয়াড়ে ঢোকাতে হবে!'

অর্থাৎ বুঝতে হবে যে, একগুঁয়ে জানোয়ারগুলোকে উঠোনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো খোঁয়াড়ে ঢুকতে রাজি নয়। তখন কারখানা থেকে জনা পাঁচেক লোক ছুটে গিয়ে হাজির হয় উঠোনে, হাঁকডাক তুলে আর ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে জানোয়ারগুলোকে তাড়া দিতে শুরু করে। সেই দৃশ্য দেখে মনিবের সে কী উল্লাস! প্রথম দিকে এভাবে পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লোকগুলোও কম মজা পায় না; এটা যেন তাদের কাছে একটা স্ফুর্তির ব্যাপার হয়ে ওঠে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লান্তিতে আর রাগে তাদের হাঁপ ধরে যায়। শুয়োরগুলো কিন্তু একেবারে নাছোড়বান্দা; পিপে যেমন সামনে-পিছনে গড়িয়ে যায়, জানোয়ারগুলোও তেমনি উঠোনময় গড়াতে শুরু করে। এই অবস্থায় লোকগুলো টাল সামলাতে পারে না। মনিব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য উপভোগ করে, মানুষ আর জানোয়ারের ছুটোছুটি দেখে অধীর হয়ে ওঠে উত্তেজনায়, পায়ে চাপড় মারে, পা ঠোকে, শিস দেয় আর চেরা গলায় চিৎকার করে :

'বাহবা! বাহবা! চালিয়ে যাও হে! বেটাদের গায়ের জড় খসিয়ে দাও তো দেখি!'

কেউ যদি চিৎপটাং হয় তাহলে তো মনিব খুশিতে একেবারে ডগমগ। আরো বেশি চিৎকার জুড়ে দেয়, মাংসল মেয়েলি উরুদুটোয় চাপড় মারে, আর হাসতে হাসতে তার দম বন্ধ হয়ে আসে।

বাস্তবিকই এই দৃশ্য কৌতুকাবহ। লালচে রঙ, নধরকান্তি একদল যমদূত উঠোনময় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে আর একদল কঙ্কালসার লোক হাঁকডাক তুলে হাত নাড়তে নাড়তে মরিয়া হয়ে ছুটছে তাদের পিছনে পিছনে! লোক-গুলোর সর্বাঙ্গ ময়দায় মাখামাখি, পরনে ছেঁড়া ন্যাকড়া, মোজাহীন পায়ে ছেঁড়া

*কাৎসাপি—আগেকার দিনে উক্রেইনীয়রা রাশিয়ানদের এই নাম ডেকে গালি দিত।

জুতো। লোকগুলো ছোটে, মুখ থুবড়ে পড়ে যায়, শুয়োরের পিছনের পা আঁকড়ে ধরে থাকে আর শুয়োরগুলো তাদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে।

একবার একটা শুয়োর রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। আমরা জনা ছয়েক শুয়োরটাকে তাড়া করে শহরের রাস্তায় রাস্তায় দু-ঘণ্টা ঘুরে বেড়াই। শেষ পর্যন্ত একজন পথচারী তাতার জানোয়ারটার সামনের দু-পায়ে লাঠি মেরে জখম করবার পর ধরতে পারা গিয়েছিল সেটাকে। জানোয়ারটাকে একটা খাটিয়ায় শুইয়ে কাঁধে তুলে আমরা নিয়ে এসেছিলাম আর সেই দৃশ্য দেখে আশেপাশের লোক অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। তাতাররা মাথা নাড়ে আর ঘেন্নায় থুথু ফেলে, রুশরা তাড়াতড়ি দল পাকিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়ায়। ময়লা রঙ, তড়বড়ে স্বভাব, একটি ছাত্র এগিয়ে এসে মাথার টুপি খুলে ফেলে; জানোয়ারটা ককিয়ে চলেছিল, সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বেশ উঁচু গলায় আর দরদের সঙ্গে আর্তেমকে জিজ্ঞেস করে:

'মা, না, বোন?'

ক্লান্ত আর্তেমের মেজাজ ঠিক ছিল না, সে জবাব দেয়, 'মনিব গো, মনিব!'

শুয়োরগুলো আমাদের দু-চোখের বিষ। আমাদের চেয়ে ওরা থাকে ভালোভাবে। ওদের শরীরের তোয়াজ করা আর ওদের বহাল তবিয়তে রাখা—এই বিশ্রী কাজদুটো করতে হয় আমাদেরই। কাজেই শুয়োরগুলোকে দেখে এক মনিব ছাড়া আমাদের আর সকলের মনে এই লাঞ্ছনাটাই টনটন করে ওঠে।

কারখানার সবাই যখন শুনল যে পুরো এক সপ্তাহ ধরে আমাকে শুয়োর-গুলোর পরিচর্যা করতে হবে তখন কয়েকজন এল আমাকে দরদ দেখাতে। ওদের এই দরদের মধ্যে এমন একটা রুশসুলভ অনুকম্পা ছিল যা বিরক্তিকর; এই অনুকম্পা আঠার মতো চটচটে হয়ে হৃদপিণ্ডের সঙ্গে লেগে থাকে এবং হৃদপিণ্ডের সমস্ত শক্তিকে লেহন করে নেয়। তবে বেশির ভাগই নির্বিকার ভাবে চুপ করে থেকেছে। শুধু কুজিন এল উপদেশ দিতে। ঘড়ঘড়ে আওয়াজ তুলে বলল:

'এসব গায়ে মাখতে নেই ! মনিবের হুকুম—যতোদূর সাধ্য মেনে চলতে হবে বৈকি···হাজার হোক মনিবেরই নুন খাচ্ছি তো !'

আর্তেম চিৎকার করে ওঠে, 'ওরে বুড়ো শয়তান ! একচোখো ধড়িবাজ···'

'থামলে কেন, বলে যাও !' বুড়ো বলে।

'যাও না ! বলো গিয়ে, মনিবের কাছেই বলো গিয়ে···'

তার কথায় বাধা দিয়ে কুজিন শান্তস্বরে ঘোষণা করে :

'বলবই তো ! এই শুনে রাখ আমার কথা, সব কথা বলে দেব তাকে ! আমার কাছে বাবা সাফ কথা, হাঁ।···'

জিপসি কুৎসিত 'গালাগালি দিয়ে উঠল, তারপর, যা সচরাচর তার মধ্যে দেখা যায় না, মুখখানাকে গোমড়া করে চুপ করে রইল।

সেইদিনই রাত্রিবেলা এক যন্ত্রণার মুহূর্তে আমি যখন নিজের কোণটিতে শুয়ে আছি, পাথরের মতো একটা আতঙ্ক নিয়ে শুনছি শ্রান্তক্লান্ত মানুষগুলোর নিশ্বাস ফেলার শ্লথ আওয়াজ, মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করছি কতগুলি বোবা আর দুর্বোধ্য শব্দ—যেমন, 'জীবন,' 'মানুষ,' 'সত্য,' 'আত্মা'—ঠিক এমনি সময়ে পোড়ানী আলতোভাবে গুড়ি মেরে মেরে এল আমার কাছে এবং আমার পাশে শুয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'ঘুমিয়েছ নাকি ?'

'না।'

'বড় তক্‌লিফ যাচ্ছে, কি বলো ভাই···'

নিজের জন্যে একটা সিগারেট পাকিয়ে নিয়ে সিগারেটে আগুন ধরাল। সিগারেটের ছোট্ট লাল আগুনের আভা এসে পড়ছে তার রেশমী দাড়িতে ও নাকের ডগায়। সিগারেটের পোড়া ছাই ফুঁ দিয়ে ফেলে জিপসি ফিসফিস করে বলল :

'শোনো—তোমায় একটা কথা বলি। শুয়োরগুলোকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেল ! কাজটা খুবই সোজা—গরম জলের সঙ্গে খানিকটা নুন খাইয়ে দেবে—বাস, আর কিচ্ছু করতে হবে না···ওতেই দেখবে জানোয়ারগুলোর গলা ফুলে উঠে ঢোল···জানোয়ারগুলো হাঁসফাঁস করে মরবে···'

'মতলবটা কি ?'

'প্রথম কথা হচ্ছে—আমরা সবাই একটু স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচব আর মনিব রীতিমতো ঘা খাবে! আর আমার পরামর্শ শোনো—তুমি চলে যাও এখান থেকে! সাশকাকে আমি বলব, তোমার পাসপোর্টটা মনিবের বাক্স থেকে চুরি করে এনে দেবে—ভগবান সহায় আছেন! কী, কথা বলছ না যে?'

'না, আমি পারব না।'

'যেমন তোমার মর্জি! তবে যতোই চেষ্টা করো বাপু, এখানে তুমি টিকতে পারবে না—মনিব তোমাকে খতম করবে···' দু-হাতে হাঁটু জড়িয়ে ধরে সে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো দুলতে লাগল। কথা বলতে লাগল খুব আস্তে আস্তে, প্রায় শোনা যায় না এমনি স্বরে:

'তোমার ভালোর জন্যেই একথা বলছি—সত্যিকারের মনের কথাই বলছি! এখানে থেকো না—চলে যাও···তুমি এখানে আসার পর থেকেই অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে···তোমাকে দেখলেই মনিবের যেন মেজাজ খিঁচড়ে যায় আর তখন সবার ওপরেই চোটপাট শুরু করে। তাছাড়া মনে রেখো, এখানকার মানুষগুলোও তোমার ওপরে চটে গেছে—তারা হয়তো তোমাকে ছেড়ে কথা বলবে না।'

'তুমিও কি সেই দলে?'

'আমি?'

'তুমিও কি আমার ওপরে চটে গেছ?'

জবাব দেবার আগে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সিগারেটের আগুনের ম্লান আভার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে, তারপর নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বলল:

'যদি আমার কথাই জিজ্ঞেস করো—বেনো জমিতে মটরের চাষ হয় না।'

'কিন্তু আমি যা বলি তা কি খাঁটি কথা নয়?'

'খাঁটি কথা, বাস্তবিকই খাঁটি কথা। কিন্তু লাভ আছে কিছু? ইঁদুর যতো বড়ো গর্তই খুঁড়ুক না কেন হাজার চেষ্টা করলেও পাহাড় ফুটো করে বেরিয়ে যেতে পারে না। তুমি কথাই বলো বা মুখ বন্ধ করেই থাক—তাতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। মানুষকে বড়ো বেশি বিশ্বাস করো তুমি—সাবধান, মানুষকে বিশ্বাস করলে বিপদে পড়তে হয়!'

'তোমাকে বিশ্বাস করলেও ?'

'তবে শুনে রাখ—আমাকে বিশ্বাস করলেও। আমি কী? আমার ওপরে কি ভরসা রাখা চলে? আমি আজ এক মানুষ কাল একেবারে অন্য মানুষ···সবাই তাই···'

শীতের রাত। বাসি ময়দার লেইয়ের গন্ধ নাকে এসে লাগছে, সেই গন্ধে গা ঘুলিয়ে ওঠে। মানুষগুলো ছাইরঙা পিণ্ডের মতো দলা পাকিয়ে চারদিকে শুয়ে আছে। চারদিকে হাল্‌কা ও ভারী নিশ্বাস পড়ার শব্দ। কে যেন ঘুমের মধ্যে কথা বলছে :

'নাতাশা···নাতা···আ···'

আরেকজন ককিয়ে উঠছে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। লোকটি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছে যে কেউ মারছে ওকে ধরে। নোংরা দেওয়াল থেকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে তিনটে কালো জানলা; যেন রাত্রির দিকে প্রসারিত তিনটে গভীর সুড়ঙ্গের মুখ। জানলার কবাট থেকে জল পড়ছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে, কারখানা-ঘরের দিক থেকে ভেসে আসছে মৃদু চাপড় দেবার শব্দ আর অস্পষ্ট কিচ-কিচ আওয়াজ—ময়দা মাখছে পোড়ানীর সহকারী বোবা-কালা নিকান্দের।

গানের মতো সুর করে করে চাপা স্বরে জিপ্‌সি বিড়বিড় করে চলেছে :

'তোমার উচিত গাঁয়ের দিকে চলে যাওয়া। গাঁয়ে গিয়ে কোথাও একটা মাষ্টারী নিও—সেইটেই হবে তোমার পক্ষে ঠিক কাজ। আর আমার কথায় বিশ্বাস করো, সেই জীবনটাও হবে সত্যিকারের ভালো। একেবারে সিধে আর সরল—একেই তো বলে মানুষের মতো জীবন! লেখাপড়া জানা থাকলে আমিও তাই করতাম—সোজা গিয়ে মাষ্টারী নিতাম কোথাও! বাচ্চা ছেলেমেয়েদের আমার খুবই ভালো লাগে। আর ভালো লাগে মেয়েছেলেকেও। এই যে দেখছ, এই পোড়া কপাল, তাও মেয়েছেলের জন্যেই! চলনসই কোনো মেয়ে যদি আমার চোখে পড়ে যায়—বাস, তাহলেই আমি একেবারে নাজেহাল। তখন আমার অবস্থা হয় ঠিক একটা গাধাবোটের মতো—

মেয়েটি আমাকে টানতে টানতে নিয়ে চলে। আমার স্বভাবচরিত্র যদি কোনো দিন বদলায় আর কোনো দিন যদি আমি গাঁয়ে গিয়ে চাষবাস নিয়ে বসতে পারি—তাহলে হয়তো বিয়ে করবার দিকেও মন যেতে পারে, একটি সৎপাত্রী দেখে বিয়ে করেও বসতে পারি···একঝাঁক বাচ্চা হবে আমাদের··· অন্তত ডজনখানেক···আমরা দুজনে তাদের মানুষ করব...দুর ছাই, কি যে সব বলছি···আর এখানে কি আছে?···মেয়েছেলের তো অভাব নেই···কাউকে দেখতে সুন্দর···কেউ মোটামুটি ভালোই···কিন্তু তারা কোনো নীতির ধার ধারে না—তোমারও আর আশ মেটে না···ভগবান জানেন কেন এমনটি হয়···ব্যাপারটা দাঁড়ায় লোভী মানুষের ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে যাওয়ার মতো··· চুবড়ি ভর্তি হয়ে যাবার পরেও সে থামে না···থামতে পারে না··· আবার নিচু হয়ে আরেকটা ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে নেয়···'

টান হয়ে সে শুয়ে পড়েছে। হাতদুটোকে পুরোপুরি ছড়িয়ে দিল—যেন কাউকে বুকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। তারপরেই, হঠাৎ কাজের কথা বলার মতো স্বাভাবিক স্বরে বলে উঠল:

'তাহলে শুয়োরগুলোর কী ব্যবস্থা করবে ঠিক করলে?'

'ওসবের মধ্যে আমি নেই।'

'বড়ো আফসোসের কথা! তোমার ক্ষতিটা কী হচ্ছে শুনি?''

'না, আমি পারব না।'

নিঃসাড়ে হামগুড়ি দিয়ে সে চুল্লির ধারে নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

চারদিক নিঃশব্দ। মনে হচ্ছে, আমি যেন কুজিনের কুচুটে চোখটা দেখতে পাচ্ছি। যে টেবিলের তলায় সে শোয় সেখানে তার চোখের নিষ্প্রভ আভা যেন ফুটে আছে।

ঘুমন্ত মানুষ, নোংরা মেঝে। তারই মধ্যে দিয়ে কল্পনার সব অদ্ভুত ছবি ভয়পাওয়া বাদুড়ের মতো থেকে থেকে ডানা ঝাপটিয়ে উঠছে, মুখ থুবড়িয়ে পড়ছে স্যাঁৎসেঁতে কালো দেওয়ালে আর ঝুলকালিমাখা সিলিংয়ের গম্বুজে— নিষ্ফল মৃত্যু ওদের।

'কোথায় গেলে হে…কুড়ুলটা আমার হাতে দাও তো দেখি…' ঘুমের মধ্যে কে যেন চিৎকার করে ওঠে।

শুয়োরগুলোকে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল।

দু-দিন পরে সকালবেলা আমি খোঁয়াড়ে ঢুকেছি—কিন্তু আমাকে দেখেও শুয়োরগুলো অন্য দিনের মতো তেড়ে এল না। অন্ধকার কোণে গায়ে গায়ে লেপটে পড়ে রইল! কেমন একটা অস্বাভাবিক ঘড়-ঘড আওয়াজ হতে লাগল ওদের গলা থেকে। লণ্ঠনের আলোয় আমি ওদের খুঁটিয়ে দেখলাম। আমার মনে হল, রাতারাতি জানোয়ারগুলোর চোখ আরো বড়ো হয়ে গেছে, ফ্যাকাশে চোখের পাতার নিচ থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে চোখগুলো। কাতর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। সেই দৃষ্টিতে শুধুই আতঙ্ক, আর এমন একটা কিছু যা প্রায় ভর্ৎসনার মতো। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওদের আর সেই নিশ্বাসে ঘরের গুমোট অন্ধকার নড়ে উঠছে যেন। মানুষের মতো গলার শব্দ করে শুয়োরগুলো ককিয়ে উঠছে; সেই ককানি ভেসে বেড়াচ্ছে ঘরের বাতাসে।

'বাস্, খতম!' মনে মনে আমি বললাম। যন্ত্রণায় আমার বুকের ভিতরটা দপ্‌দপ্ করতে শুরু করেছে।

কারখানা-ঘরের ভিতরে ঢুকে আমি জিপ্‌সিকে বাইরের গলিতে ডেকে নিয়ে এলাম। গোঁফে আর দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে হাসি হাসি মুখে বেরিয়ে এল সে।

তুমি কি শুয়োরগুলোকে বিষ খাইয়েছ?'

আমার প্রশ্ন শুনে সে অস্বস্তির সঙ্গে পায়ে পা ঘষতে লাগল, শেষকালে কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল:

'মরে গেছে নাকি? চলো একবার দেখে আসি।'

উঠোনে এসে ঠাট্টার সুরে আবার জিজ্ঞেস করল: 'কি হে, মনিবের কাছে লাগাতে যাবে নাকি?'

আমি কোনো কথা বললাম না। আঙুলে দাড়ি জড়াতে জড়াতে কৈফিয়ত দেবার মতো সুরে সে বলল :

'এটা হচ্ছে ইয়াশ্কার কাণ্ড। ছেলেটা পুঁচকে শয়তান! আমরা দুজনে যখন কথা বলছিলাম তখন ও শুনেছিল। তারপর কাল আমার কাছে এসে বলে কি, পাশকা-মামা, বলো তো আমিই শুয়োরগুলোর দফা শেষ করে দিয়ে আসি। নুন খাওয়ানোর ভারটা আমার ওপরেই থাক। আমি বলি, খবরদার বলছি······'

খোঁয়াড়ের দরজার সামনে এসে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখদুটোকে সরু করে ভিতরের অন্ধকারের দিকে উঁকি দিয়ে দেখল একবার। খোঁয়াড়ের ভিতর থেকে জানোয়ারগুলোর সাঁই-সাঁই শ্বাস টানার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভাঙা ভাঙা শব্দ। গলা খাঁকারির মতো মনে হয়। মুখটাকে বিকৃত করে ভুরু কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে সে বলল :

'দূর ছাই! কী বিশ্রী কাণ্ড সব! এমনিতে আমি হাসতে হাসতে মিথ্যে কথা বলতে পারি—সে-ব্যাপারে আমি ওস্তাদ। সত্যি বলতে কি, মিথ্যে কথা বলতে ভালোই লাগে আমার। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন অবস্থায় পড়তে হয় যে আমার মুখেও মিথ্যে আসে না···কিছুতেই পারি না মিথ্যে বলতে···কিছুতেই না···'

দরজার কাছ থেকে সরে এসে, ঠাণ্ডায় হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে সে তাকাল আমার চোখের দিকে। তার মনের বিরক্তি মুখের দুর্বোধ্য আওয়াজে বেরিয়ে পড়ছে। টেনে টেনে সে বলতে লাগল :

'বিশ্রী—বিশ্রী! দেখে নিও আজ কী তোলপাড় কাণ্ড হয়! মনিব কিছুতেই ছেড়ে কথা বলবে না! ইয়াশ্কার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে না নেয় তো কি বলেছি···'

'কেন, ইয়াশ্কার কি দোষ?'

চোখ টিপে সে বলল, 'বড়োরা দোষ করে, ছোটরা শাস্তি পায়—সংসারের নিয়মই এই।'

কথাটা বলেই সে ভুরু কুঁচকিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার

দিকে, তারপর চালার দিকে ছুটে চলে যেতে যেতে বিড়বিড় করে বলে গেল :

'যাও, নালিশ করো গিয়ে…'

আমি মনিবের কাছে গেলাম। মনিব এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে। মুখটা ফ্যাকাশে, মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে আছে। মাথার খুলিটা এবড়ো খেবড়ো, জায়গায় জায়গায় ঢিবির মতো উঁচু আর সেই মাথার খুলির ওপরে লেপ্‌টে রয়েছে কালো চুল। ঠ্যাঙদুটোকে ফাঁক করে টেবিলের সামনে বসে আছে সে, পরনের লালচে রঙের লম্বা জামাটা হাঁটু পর্যন্ত গোটানো। একটা কটা বেড়াল পরম নিশ্চিন্তে গুটলি পাকিয়ে বসে আছে তার কোলের উপরে।

ঘরের মেয়েলোকটি টেবিলের ওপরে চায়ের সারঞ্জাম এনে রাখছে : নরম খস্‌খস শব্দ তুলে চলাফেরা করছে ঘরের মধ্যে। শব্দটা শুনে মনে হয়, একটা ন্যাকড়ার পুঁটলিকে অদৃশ্য একটা হাত টেনে নিয়ে চলেছে মেঝের ওপর দিয়ে।

'কী ব্যাপার?' মুচকি হেসে মনিব জিজ্ঞেস করল।

'শুয়োরগুলোর অসুখ করেছে।'

কোলের বেড়ালটাকে ছুঁড়ে আমার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর হাতদুটো মুঠি পাকিয়ে ষাঁড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার দিকে। তার ডান চোখটা ধ্বক্‌ধ্বক্ করে জ্বলছে : বাঁ চোখটা লাল হয়ে উঠেছে আর জলে ভরে গেছে।

'কী, কী বললে?' হাঁপাতে হাঁপাতে সে হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

'আপনি বরং সময় নষ্ট না করে শুয়োরের ডাক্তারকে ডাকুন…'

আমার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল সে, তারপর অদ্ভুত ভঙ্গিতে চাপড় মারতে লাগল দুই কানের ওপরে। শরীরটা হঠাৎ যেন ফুলে উঠে নীল হয়ে উঠেছে। যন্ত্রণাভরা গলায় উন্মত্ত একটা চিৎকার করে উঠল :

'আমি জানি এটা কাদের শয়তানি…'

ঘরের মেয়েলোকটি গুটি-গুটি এগিয়ে এসেছে। আমি এই প্রথম তাকে কথা বলতে শুনলাম—কাঁপা-কাঁপা সর্দি-বসা গলার স্বর।

'পুলিসে খবর দাও, ভাসিয়া, দেরি কোরো না, এক্ষুনি পুলিসে খবর দাও…'

ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো মেয়েলোকটির গাল; গালদুটো কাঁপছে। আশঙ্কায় হাঁ হয়ে গেছে প্রকাণ্ড মুখটা, বেরিয়ে পড়েছে অসমান কালো কালো দাঁত! মেয়েলোকটিকে নির্দয়ভাবে ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে মনিব এগিয়ে এল, তারপর দেওয়ালে ঝোলানো জামাকাপড়ের মধ্যে থেকে খানকয়েক টেনে নিয়ে বগলদাবা করে ছুটে গেল দরজার দিকে।

কিন্তু উঠোনে বেরিয়ে এসে যখন খোঁয়াড়ের ভিতরটা উঁকি দিয়ে দেখে আর ঘড়ঘড় শব্দে জানোয়ারগুলোর শ্বাস টানার শব্দ শোনে—তখন হঠাৎ একেবারে শান্ত হয়ে গিয়ে শুধু বলে:

'ভিতর থেকে তিনটে লোককে ডেকে নিয়ে এস তো।'

শাতুনভ, আর্তেম ও সৈনিকটি বেরিয়ে আসে কারখানা থেকে। আমাদের মুখের দিকে না তাকিয়েই মনিব হুঙ্কার ছাড়ে:

'বাইরে নিয়ে এসো ওদের!'

চারটে মৃতপ্রায় নোংরা জানোয়ারকে তুলে নিয়ে এসে আমরা বাইরে উঠোনে শুইয়ে দিই। আকাশে আবছা আভা ফুটেছে। ঝরে পড়ছে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ; মাটিতে রাখা লণ্ঠনের আলো পড়েছে বরফের ওপরে আর ভারী হয়ে ঝুলে-পড়া শুয়োরের মাথার ওপরে। একটা শুয়োরের একটা চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে কোটর থেকে—বঁড়শি-বেঁধা মাছের চোখ যেমন বেরিয়ে আসে।

জানোয়ারগুলো মরছে; আর মাথা নিচু করে তাকিয়ে আছে মনিব; নির্বাক ও নিশ্চল; শেয়ালের লোমের কোটটা কাঁধের ওপরে ফেলা।

'তোমরা যে যার কাজে যাও! ইয়েগরকে এখানে পাঠিয়ে দিও!' নিষ্প্রাণ গলায় সে বলে।

আমরা ফিরে আসি। ময়দার বস্তা ছড়ানো গলিপথটা দিয়ে ঠেলাঠেলি করে চলতে চলতে আর্তেম ফিসফিস করে বলে, 'ওষুধটা ঠিক ধরেছে! বাছাধনের এমন কাহিল অবস্থা যে রাগটুকু পর্যন্ত নেই…'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে শাতুনভ বলে ওঠে, 'একটু সবুর করেই দেখ! ভিজে কাঠ তো আর দপ করে জলে ওঠে না...'

সকলের সঙ্গে ভিতরে না গিয়ে আমি গলিতেই রয়ে গেলাম। একটা ফাটল দিয়ে তাকিয়ে রইলাম উঠোনের দিকে। ভোরের আবছা আলোয় লণ্ঠনের আলো টিম টিম করছে, কোনো রকমে খানিকটা আলো গিয়ে পড়েছে চারটে ছাইরঙা থলের ওপরে। থলে চারটে এক-একবার ফুলে ওঠে, আবার চুপ্‌সে যায়—সঙ্গে সঙ্গে সাঁই-সাঁই ঘড়-ঘড় আওয়াজ। মনিবের খালি মাথাটা ঝুঁকে রয়েছে থলে চারটের ওপরে, মুখটা ঢাকা পড়েছে ঝুলে-পড়া চুলে। একটুও নড়াচড়া না করে অনেকক্ষণ সে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, ফারকোটে ঢাকা শরীরটাকে দেখে মনে হয় যেন একটা ঘণ্টা।...তারপর আমি শুনতে পাই নাকটানার শব্দ আর চাপা ফিসফিস কথা :

'সোনা-মানিকরা, যন্ত্রণা হচ্ছে বুঝি? আহা রে...ষাট, ষাট...'

জানোয়ারগুলো যেন আরো জোরে জোরে শ্বাস টানছে।

সে মাথা তোলে, চারদিকে তাকায়, আর তখন আমি স্পষ্ট দেখতে পাই তার মুখটা চোখের জলে ভেসে গেছে। তারপর সে দু-হাত দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে; ব্যথা পেলে বাচ্চা ছেলে যেমন হাবভাব করে, তেমনি হাবভাব তার। তারপর সরে আসে, একটা চোঙ থেকে একমুঠো খড় টেনে নেয়, আবার ফিরে যায়, হাঁটু মুড়ে বসে, শুয়োরের নাকটা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে, পরক্ষণেই খড় ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ায়, শুয়োরগুলোর চারপাশে আস্তে আস্তে পাক খেতে থাকে।

একবার পাক খায়, তারপরে আরেকবার; পদক্ষেপ দ্রুত হয়, হঠাৎ ছুটতে শুরু করে, বোঁ বোঁ করে পাক খায়, দুদ্দাড় করে ছোটে, মুঠো পাকিয়ে শূন্যে ঘুষি ছোঁড়ে। তার কোটের ঝুল-অংশটুকু পৎ-পৎ করে পায়ের চারদিকে, হোঁচট খেয়ে প্রায় পড়ে যাবার মতো অবস্থা হয়। হঠাৎ থেমে পড়ে, মাথা ঝাঁকায় আর গোঙাতে থাকে। শেষকালে—যেন হঠাৎ তার পা দুটো অবশ হয়ে গেছে এমনি আচমকা—পাছা থেব্‌ড়ে বসে পড়ে মাটিতে

আর তাতাররা প্রার্থনা করবার সময়ে যেমন করে, তেমনিভাবে মুখ রগড়াতে থাকে দু-হাতের তালুতে।

'ষাট, ষাট, সোনা-মানিকরা আমার···ষাট ষাট!'

আবছায়ার মধ্যে অলসভাবে ভাসতে ভাসতে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে ইয়েগর। তার মুখে পাইপ; পাইপের আগুন মাঝে মাঝে উসকে উঠে অন্ধকার মুখটাকে উদ্ভাসিত করে তুলছে। মুখটাকে দেখে মনে হয়, ছিন্নভিন্ন গাঁটওলা তক্তা দিয়ে তাড়াহুড়োর মধ্যে মুখটা তৈরি। রক্তিম কানের পুরু মাংসপিণ্ডে চকচক করছে মাকড়ি।

'ইয়েগরি!' নরম সুরে মনিব ডাকে।

'আজ্ঞে?'

'ওরা আমার পুষিদের বিষ খাইয়েছে···'

'ছোঁড়াটা নাকি?'

'না।'

'তাহলে কে?'

'পাশ্‌কা আর অর্তিয়ুকভ। কুজ্‌কিন আমাকে বলেছে···'

'ওদের ধরে আচ্ছা করে ধোলাই দেব নাকি?'

দুপায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত স্বরে মনিব বলে:

'না, এখন থাক।'

'এগুলো সব নরকের কীট।' ইয়েগর মনের ঝাল প্রকাশ করে।

'তা—তা—বটে! কিন্তু এই পশুরা ওদের কাছে কী দোষ করেছিল—বলো তুমি?'

ইয়েগর থুতু ফেলে; থুতুটা গিয়ে পড়ে তার জুতোর ওপরে। পা তুলে কোটের কিনার দিয়ে জুতোটা মুছে নেয়।

শীতের দিনের ধূসর আকাশ কফিনের ঢাকনার মতো ছোট্ট উঠোনটার ওপরে ঝুলে আছে। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে শুরু হয়েছে বিষণ্ণ শীতার্ত দিন। মুমূর্ষু জানোয়ারগুলোর দিকে ইয়েগর এগিয়ে আসে।

'এগুলোকে মেরে ফেলাই ভালো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মনিব বলে, 'কী লাভ ? যতোক্ষণ পারে বেঁচে থাকুক…'

'এগুলো এখন মেরে ফেলতে পারলে কসাইয়ের কাছে বিক্রি করে আসা যায়। মাংস তো আর পচে যায়নি !'

'কসাইয়ের ভারি বয়ে গেছে এই মাংস কিনতে।' আবার উঁচু হয়ে বসে একটা শুয়োরের ফুলে-ওঠা গর্দানে হাত বুলোতে বুলোতে সেমিয়োনভ বলে।

'নিশ্চয়ই কিনবে। কিনবে না কেন শুনি ? আমি বলব, মনিবের আর শুয়োর পুষবার ইচ্ছে নেই, তাই মনিব শুয়োরগুলোকে মেরে ফেলেছে। বলব যে শুয়োরগুলোর শরীরে কোনো রকম রোগ ছিল না…'

মনিব নির্বাক।

'তাহলে, কী করব ?' ইয়েগর নাছোড়বান্দা।

'কী ?'

মনিব উঠে দাঁড়িয়েছে। তারপর আস্তে আস্তে আরেকবার পাক খায় শুয়োরগুলোর চারদিকে, আর সুর করে করে চাপা স্বরে বলে :

'সোনা-মানিকরা আমার…পুষিরা আমার…বাছারা আমার…'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়, তারপর মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে :

'মেরে ফেল !'

আমরা আশঙ্কা করছি, ঝড ফেটে পড়বে, ছাঁটাই শুরু হবে। আমরা ভেবেছিলাম, মনিব হয়তো শাস্তি হিসেবে বাড়তি একবস্তা ময়দা বরাদ্দ করবে। জিপসিকে দেখে বোঝা যায়, সে খুব স্বস্তি বোধ করছে না; মুখের ওপরে একটা বেপরোয়া ভাব ফুটিয়ে তুলে বীরদর্পে চিৎকার করে চলে :

'সেঁকা দাও, ফোটাও !'

কারখানার ভিতরে থমথমে নিস্তব্ধতা। সবাই আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকায়। কুজিন বিড়বিড় করে :

'দোষী, নির্দোষ, কেউ রেহাই পাবে না—সবাইকে ও ছাঁটাই করবে…'

আবহাওয়াটা আরো ভারী হয়ে ওঠে, আরো বিষণ্ণ। এখানে ওখানে ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা খেতে বসেছি, এমন সময়

ভূতপূর্ব সৈনিক মিলোভ আকর্ণবিস্তৃত হাঁ করে বিশ্রীভাবে হাসতে শুরু করে আর চামচের ঘায়ে কুজিনের কপাল ফাটিয়ে দেয়।

বুড়ো লোকটি যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে, কপাল চেপে ধরে, কুচুটে একচোখের দৃষ্টি মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে আর গোঙায় :

'ভাইসব, আমি কী দোষ করেছি ?'

সঙ্গে সঙ্গে একটা তুমুল হট্টগোল শুরু হয়ে যায়, গালিগালাজ চলতে থাকে আর হাত নাড়তে নাড়তে তিনটে লোক মারমুখী হয়ে সৈনিকের দিকে ছুটে যায়। সৈনিকটি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে তেমনি হেসে গড়িয়ে পড়ে আর বলে :

'এই শাস্তিটা দেওয়া হল ওর শয়তানির জন্যে! ইয়েগর আমাকে বলেছে···শুয়োরগুলোকে কে বিষ খাইয়েছে তা মনিব জানে···'

ফ্যাকাশে মুখে আর অস্বাভাবিক একটা উত্তেজনা নিয়ে জিপসি চুল্লির কাছ থেকে ছুটে আসে, তারপর কুজিনের টুঁটি টিপে ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলে :

'আবার ? নরকের কীট, এত মার খেয়েও তোর শিক্ষা হয় না ? আবার লাগানি ভাঙানি শুরু হয়েছে ?'

কাঁপা কাঁপা বুড়োটে গলায় কুজিন গোঙাচ্ছে : 'তোমরা কি বলতে চাও, ঘটনাটা সত্যি নয় ? তুমিই তো বাপু শুরু করেছিলে—বলো, শুরু করোনি ? আমি নিজের কানে শুনলাম, বকবক মহারাজকে তুমি বদ মতলব দিচ্ছিলে—বলো, শুনিনি ?···'

মুখ থেকে কয়েকটা দুর্বোধ্য শব্দ বার করে জিপ্‌সি হাত তোলে। কিন্তু তার গায়ের সঙ্গে লেপ্‌টে দাঁড়িয়ে আছে আর্তেম আর বলছে :

'ওকে মেরো না পাশ্‌কা, হাত নামাও···'

শুরু হয়ে যায় ছুটোপাটি। শাতুনভ ও আর্তেম পাশ্‌কাকে চেপে ধরে থাকে আর পাশ্‌কা চেষ্টা করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে। সঙ্গে সঙ্গে লাথি ছোঁড়ে, হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, আর উত্তেজনায় বিস্ফারিত চোখের সাদা অংশকে হিংস্রভাবে পাক খাওয়াতে থাকে।

'ছেড়ে দাও আমাকে···ও ব্যাটাকে আজ আমি শেষ করব···'

এদিকে সেই সত্যবাদী বুড়ো মানুষটিও কম যায় না! তার পরনের ময়লা শার্টের গর্দানটা জিপ্‌সি আঁকড়ে ধরে আছে, সেই অবস্থাতেও সে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে আর বকবক করে চলেছে :

'আমার কাছে সাফ কথা। কোথাও কোনো গোলমাল নেই তো আমিও চুপচাপ। আর যদি দেখি কোনো বদ ব্যাপার ঘটছে তাহলে আমারও কাজ হবে সে-কথা বলে দেওয়া! শুনে রাখ বদমায়েশের দল! আমার কল্‌জে ছিড়ে নিলেও এর অন্যথা হবে না!'

এই কথা বলে সে আচমকা ইয়াশ্‌কার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার মাথায় ঘা দেয়, ঘুষি মেরে ফেলে দেয় তাকে, লাথি মারে, তারপর আশ্চর্যরকমের তরুণোচিত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার শরীরের ওপরে লাফাতে থাকে আর বলে :

'তুই—তুই—তোর জন্মেই তো! তুই-ই তো মুন খাইয়েছিস···হতভাগা বেজন্মা···তুই···তুই···'

একলাফে আর্তেম বুড়োর দিকে এগিয়ে আসে, তারপর মাথা দিয়ে তার বুকের ওপরে ঢুঁ মারে। কাৎরাতে কাৎরাতে বুড়ো মাটিতে পড়ে যায়, তারপরে গোঙাতে থাকে।

এদিকে ইয়াশ্‌কা ক্ষেপে গেছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বীভৎস গালিগালাজ দিচ্ছে। তারপর সে ঠিক একটা বাঘের মতো বুড়োর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার গায়ের জামা ছিঁড়ে দেয় আর দুমদাম করে ঘুষি চালাতে থাকে। আমি চেষ্টা করি ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসতে। চারদিকে শুরু হয়ে যায় প্রচণ্ড রকমের দাপাদপি আর ছুটোছুটি, বাতাসে ধুলোর মেঘ উড়তে থাকে, দাঁতখিচুনি দেখা যায়, হিংস্র হুঙ্কার ওঠে। উন্মত্তের মতো চিৎকার জুড়ে দিয়েছে জিপসি। শুরু হয়ে গেছে নির্বিচার মারপিট। পিছন দিকে শুনতে পাচ্ছি দমাদ্দম ঘুষির আওয়াজ আর দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ। লেস্‌চেভ নামে একটা লোক আমার কাঁধ ধরে টানছে আর শাসাচ্ছে :

'চলে এস দেখি—জনে জনে হয়ে যাক! হাতাহাতি করেই ব্যাপারটার ফয়শালা হোক! চলে এস—না এলে ভালো হবে না বলছি।'

মানুষগুলোর শরীরের রক্ত দূষিত হয়ে গেছে, রক্তের প্রবাহ নেই,

পচা খাবার আর পচা বাতাস বিষাক্ত করে তুলেছে সেই রক্তকে, অন্তহীন অন্যায় সহ্য করতে করতে ক্লেদ জমেছে সেই রক্তে—আর এই রক্ত এখন উঠে এসেছে মানুষগুলোর মাথায়। মুখগুলো সাদা হয়ে গেছে, কানগুলো লাল, টকটকে চোখগুলোতে দুর্নিরীক্ষ্য ক্রোধের ঝিলিক, দাঁতে দাঁত চাপা শক্ত চোয়াল—সব মিলিয়ে কতগুলি পাশব ও বিকৃত মুখ।

আর্তেম ছুটতে ছুটতে আসে এবং লেস্‌চভের হিংস্র মুখের কাছে মুখ নিয়ে চিৎকার করে বলে :

'মনিব আসছে—মনিব !'

বাতাস যেমন আবর্জনাকে পরিষ্কার করে তেমনি এই কথাটি ঘরের ভিতরকার সমস্ত হৈ-হট্টগোলকে সাফ করে নিযে গেল। চটপট সবাই ফিরে গেছে নিজের নিজের জায়গায়, কারখানা ঘরটা আবার আগেকার মতো শান্ত। শুধু শোনা যাচ্ছে ক্লান্ত ও ক্রুদ্ধ মানুষগুলোর হাঁপানির মতো টেনে টেনে শ্বাস ফেলা। আর যে হাতগুলোর মুঠোয় এতক্ষণ চামচ ধরা ছিল, সেগুলো কাঁপছে।

রুটির কারখানার দু'জন মিস্ত্রী এসে দাঁড়িয়েছে খিলানের নিচে। একজন হচ্ছে মিষ্টিরুটি সেঁকার মিস্ত্রী ফুলবাবু ইয়াকভ ভিশনেভস্কি; অপরজন পাঁউরুটি সেঁকার মিস্ত্রী বাশ্‌কিন। এই দ্বিতীয় লোকটির ফুলো ফুলো শরীর, ইটের মতো লাল মুখ, প্যাঁচার মতো চোখ আর লোকটি হাঁপানী রোগীর মতো অনবরত কাশে।

হতাশা ও খেদের সুরে দ্বিতীয় লোকটি জিজ্ঞেস করে, 'কি হে মারামারি আর চলবে না বুঝি ?'

ভিশ্‌নেভস্কি তার সরু মোচটা পাকাতে থাকে। তার হাতের ভঙ্গিটা চটপটে; সারা হাতে পোড়া দাগ আর ফোস্‌কা। কথা বলে যেন একটা ছাগল উল্লাসে ব্যা-ব্যা ডাক ছাড়ছে। বলে :

'কি হে জড়দাবের দল, খাবারের পোকা···'

শুনে সবাই সমস্বরে প্রচণ্ড গালাগালি দিতে শুরু করেছে। এতক্ষণ ধরে ওরা যে রাগটুকু মনের মধ্যে পুষে রেখে দিয়েছিল তা ফেটে বেরিয়ে

এসেছে যেন। এই দুজন মিস্ত্রীকে আমরা দু-চোখে দেখতে পারি না। ওদের কাজ আমাদের চেয়ে সহজ, মাইনে আমাদের চেয়ে বেশি। গালাগালির জবাবে ওরাও সমানে গালাগালি দেয়। মনে হতে থাকে এক্ষুনি বোধ হয় আবার একটা মারামারি শুরু হয়ে যাবে। ঠিক এমনি সময়ে হঠাৎ ইয়াশ্‌কা টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়; ওর সারা মুখটা চোখের জলে মাখামাখি, উদভ্রান্ত চেহারা; টলতে টলতে এগিয়ে যায়, তারপর বুকটা চেপে ধরে মেঝের ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ে।

ওকে তুলে নিয়ে গেলাম রুটির কারখানায়। আমাদের কারখানা-ঘরের চেয়ে রুটির কারখানাটা অনেক বেশি পরিষ্কার, অনেক বেশি খোলামেলা। ওখানে নিয়ে গিয়ে ময়দা রাখার একটা পুরনো পাত্রের ওপরে শুইয়ে দিলাম ওকে। ওর মুখটা হয়ে উঠেছে হল্‌দে হাতির দাঁতের মতো; নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে, মরে গেছে মনে হয়। এই কাণ্ড দেখে সমস্ত হৈচৈ বন্ধ হয়ে গেছে, আসন্ন একটা দুর্ঘটনার কথা ভেবে সবাই মনমরা, আর সবাই চাপা স্বরে কুজিনকে শাপান্ত করছে।

'একচোখো শয়তান! তোর জন্যই ছেলেটা মরতে চলেছে!'

'পাজি বদমায়েশ! জেল হওয়া উচিত তোর!

বুড়ো লোকটিও রেগে গিয়ে পালটা জবাব দেয়: 'তোমরা যা ভাবছ তা নয়! ছেলেটা মূর্ছা গেছে বা যা হোক কিছু…'

আর্তেম ও আমি ছেলেটির জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছি। আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকিয়েছে ছেলেটি; হাসি হাসি চঞ্চল সেই দুটি চোখ, টানা টানা চোখের পাতা। নিষ্প্রাণ গলায় জিজ্ঞেস করে:

'আমরা কি পৌঁছে গেছি?'

'কোথায় পৌঁছে গেছি! কী সব আবোল তাবোল বকছিস!' উদ্বেগের স্বরে তার ভাই বলে ওঠে, 'সব জায়গায় তুই নাক গলাতে যাবি—তোকে সামলাতে সামলাতেই আমি অস্থির…পড়ে গেলি কি করে?'

'কোথা থেকে পড়ে গেলাম?' ভুরু তুলে অবাক হবার মতো ভঙ্গিতে ছেলেটি জিজ্ঞেস করে, 'আমি কি পড়ে গিয়েছিলাম? নিশ্চয়ই ভুলে গেছি…

একটা খপ্‌নো দেখছিলাম—একটা নৌকোয় চেপে আমরা চলেছি—তুমি আর আমি, কাঁকড়া ধরছি দুজনে···আমাদের কাছে চার আছে···এক বোতল ভদ্‌কাও আছে···'

বলতে বলতে সে চোখ বোজে; ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ পরে মৃদু অস্পষ্ট স্বরে আবার বলে চলে:

'এবার মনে পড়েছে—ঘুষি মেরে আমার বুকের ভেতরটায় ওলোট পালোট করে দিয়েছে···কুজিনের কাণ্ড! লোকটা আমার দু-চোখের বিখ!···ঠিক-মতো দম নিতে পারছি না আমি···বুড়ো গর্দভ!···ওকে চিনতে বাকি নেই··· নিজের বৌকে ঠেঙিয়ে মেরে ফেলেছে! নিজের ছেলের বৌকে জালিয়ে খেয়েছিল। একই গাঁয়ে আমাদের দেশ···কাজেই লোকটাকে চিনতে আমার আর বাকি নেই···।'

'চুপ কর তো দেখি। ঘুমোতে চেষ্টা কর বরং।' আর্তম ধমক দিয়ে ওঠে।

'আমাদের গাঁয়ের নাম ইয়েগিলদেয়েভো···কথা বলতে আমার কষ্ট্তো হচ্ছে···নইলে দেখতে···'

এমনভাবে কথা বলছে যেন আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ছে ও। আর অনবরত সিঁটিয়ে কালো হয়ে ওঠা ঠোঁটদুটোকে চাটছে।

মহানন্দে চিৎকার করতে করতে কে যেন রুটির কারখানায় ছুটে আসে:

'সবাই শোন, একটা সুসংবাদ আছে! মনিব মদের কেঁড়ে নিয়ে বসেছে!'

সঙ্গে সঙ্গে গোটা কারখানাটা জেগে ওঠে। হো হো হাসি আর তীক্ষ্ণ শিস। খুশি ও দরদভরা ঝলমলে দৃষ্টিতে সবাই তাকাচ্ছে সবার দিকে। সবাই আশঙ্কা করছিল শুয়োরগুলোকে মেরে ফেলবার জন্যে মালিক ভয়ানক-ভাবে প্রতিহিংসা নেবে; আপাতত সে সম্ভাবনা লোপ পেয়ে গেল। তাছাড়া মালিক যতোক্ষণ মাতাল অবস্থায় থাকে ততোক্ষণ কম কাজ করলেও চলে।

ভানোক উলানভ লাফাতে লাফাতে এসে হাজির। লোকটার শয়তানি

বুদ্ধি আছে, বাদবিসম্বাদ শুরু হলে ধারেকাছে থাকে না। এখন কিন্তু একেবারে কারখানা-ঘরের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে :

'এসো হে, একটা গান ধরা যাক।'

চোখ বুজে, কণ্ঠমণি ঠেলে বার করে, চড়া ভরাট গলায় জিপসি গান ধরে :

আসে এক ছাগ পথ বরাবর

কুড়িজন লোক টেবিল চাপড়ে গানের সঙ্গে গলা মেলায় :

ফুর্তির রাজা সে অল্প বয়েস
দাড়ি নাড়ে টুকটুক···

পা দাপাতে দাপাতে জিপসি ছোটাছুটি করে আর সেই বেখাপ্পা অদ্ভুত গানের শেষ অংশটুকু সবাই একসঙ্গে গেয়ে ওঠে :

···টুকটুক দুলদুল চুলবুল !

এদিকে একফালি নোংরা মেঝের ওপরে ছোট্ট নরম একটি মূর্তি ঝলসানো পোকার মতো দাপাদাপি করে চলে। বেহুঁশ হয়ে হাত-পা ছোঁড়ে আর সেই সঙ্গে ওড়ে ধুলোর মেঘ।

'থামিও না, চলুক !' সবাই একসঙ্গে চেঁচায়। উল্লাসের এই আচমকা চিৎকারও কম ন্যক্কারজনক বা যন্ত্রণাদায়ক নয়—কিছুক্ষণ আগেকার ক্রোধের বিকারের মতোই।

রাত্রিবেলা 'ঝুমঝুম'-এর অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। খুব বেশি রকমের জ্বর আর অস্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস। এক-একবার হাঁ করে ঘরের ভিতরকার টক ও ঝাঁজালো বাতাস খানিকটা টেনে নেয় ফুসফুসের মধ্যে ; তারপর ঠোঁটদুটোকে ছুঁচলো করে সরু একটা দমকে বার করে দেয়। মনে হতে পারে, সে শিস দিতে চাইছে কিন্তু ক্ষমতায় কুলোচ্ছে না। ঘন ঘন জল খেতে চাইছে। কিন্তু জল দেবার পরে এক চুমুক খেয়েই মাথা নাড়ে আর ঝাপসা চোখে মিষ্টি একটু হাসি ফুটিয়ে অস্পষ্ট স্বরে বলে :

'আমারই ভুল হয়ে গেছে—জলতেষ্টা পায়নি।—

ভদকা আর ভিনিগার দিয়ে আমি ওর সর্বাঙ্গ ভলে দিলাম। মুখের ওপরে

অস্পষ্ট একটু হাসির ছাপ নিয়ে ও ঘুমিয়ে পড়ল। সারা মুখে ময়দার গুঁড়ো লেগে আছে, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল লেপটে রয়েছে কপালের ওপরে ; আর তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে নিজেও গলে গলে যাচ্ছে যেন। গায়ে একটা নোংরা শার্ট, জীর্ণ হতে হতে ন্যাকড়ার মতো হয়ে উঠেছে আর শুকিয়ে গুটলি পাকানো ময়দার লেইয়ে শার্টটা একেবারে মাখামাখি। শার্টের নিচে তার বুকের ওঠানামা টের পাওয়া যায় কি যায় না।

আমার ওপরে সবাই একেবারে খেঁকিয়ে উঠল।

'হয়েছে, হয়েছে, আর ডাক্তারিপনা ফলাতে হবে না। ময়দা মাখার মতো অমন ডলাই-মলাই আমরা সকলেই করতে পারি···'

ভারি বিশ্রী লাগছে আমার। মনে হতে থাকে, এই লোকগুলির সঙ্গে আমি যেন জবরদস্তি আত্মীয়তা করতে এসেছি। একমাত্র আর্তেম ও পাশ্‌-কাকে দেখেই মনে হল যে আমার মনোভাবটা ওরা বুঝতে পারছে। আমাকে উৎসাহিত করবার জন্যে জিপসি বলল :

'ঠিক আছে দমে যেও না! কন্যে তুমি বানাও পিঠেপুলি, রসের বাটি হাতে তৈরি ছেলের দল!'

আর আর্তেম তো হাঁসফাঁস করছে। আমাকে নিয়ে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। প্রাণপণে চেষ্টা করছে দু-একটা রসিকতা করতে কিন্তু আজ যেন ওর মেজাজটি ঠিক নেই। বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। বার দুয়েক আমাকে জিজ্ঞেস করল :

'কি মনে হচ্ছে বলো তো, ইয়াশ্‌কার কি খুব বেশি চোট লেগেছে?'

শাতুনভ অন্যান্য দিনের চেয়েও উচ্চকণ্ঠ ; নিজের প্রিয় গানটি গেয়ে চলেছে সে :

সদর পথে দাঁড়িয়ে থেকে
তাকিয়ে আছি ভিতর পানে
দেখি কোথায় ভাগ্য আমার
যায় গো নিয়ে সুখ যাতনা।

রাত্রিবেলা আমি 'ঝুমঝুম'-এর পাশটিতে মেঝের ওপরেই শুয়ে রইলাম।

চট পেতে পেতে আমি যখন বিছানাটা তৈরি করছি, ও হঠাৎ জেগে উঠে আতঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করল :

'কে ? কে ? কে এখানে ? বকবকল মহারাজ—তুমি নাকি ?'

উঠে বসবার চেষ্টা করতে গিয়ে পারল না। পড়ে গেল। মাথাটা দম করে গিয়ে লাগল কালো চটের বালিশে।

সবাই ঘুমোচ্ছে। ঘরের বদ্ধ গুমোট বাতাস কেঁপে উঠছে ভারী নিশ্বাস ফেলবার শব্দে আর খক্ খক্ কাশিতে। জানলার নোংরা শার্সির ভিতর দিয়ে দেখা যায়—বাইরে নীল তারা ছিটনো থমথমে রাত্রি। তারাগুলোকে দেখাচ্ছে বিশ্রীরকমের ছোট ছোট আর দূরে দূরে। দেওয়ালের একটা কোণের দিকে জ্বলছে ছোট একটা টিনের বাতি ; সেই বাতির আলোয় দেখা যাচ্ছে, তাকের ওপরে সার সার সাজানো রুটির তাল ; রুটিগুলোর চেহারা চুলহীন মাথার খুলির মতো। ময়দার লেই রাখার একটা বাক্সের ওপরে বলের মতো তালগোল পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে বোবা ও কালা নিকান্দের। যে টেবিলের ওপরে রুটিগুলোকে ওজন করা হয় ও পাকানো হয় তার তলা থেকে পোড়ানীর হলদে আতুড়'ঘেয়ো পা বেরিয়ে আছে।

নরম স্বরে ইয়াশ্কা ডাকল :

'বকবকল মহারাজ···'

'কি বলছ ?'

'আমার কথ্টো হচ্ছে···'

'আচ্ছা এস, গল্প করা যাক, একটা গল্প বলো আমাকে···'

'কী গল্প বলব বলো তো···ব্রাউনির গল্প বলি ?'

'বেশ তাই বলো···'

কিছুক্ষণ সে কোনো কথাই বলল না। তারপর নেমে এল বাক্সের ওপর থেকে, শুয়ে পড়ল, গরম মাথাটা রাখল আমার বুকের ওপরে, তারপর স্বপ্নাচ্ছন্ন চাপা স্বরে বলতে শুরু করল :

'আমার বাবাকে জেলে ধরে নিয়ে যাবার আগে ঘটনাটা ঘটেছিল। আমার বয়থ তখন খুবই কম। মনে আছে, তখন থময়টা ছিল গরমকাল,

বাইরে একটা খড়ের গাড়ির ওপরে আরাম করে আমি ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে যায় আর তাকে দেখি। খদরের সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে সে নেমে আসছে। একেবারে পুঁচকে চেহারা, হাতের একটা মুঠির চেয়ে বড়ো নয়। তার সারা গায়ে লোম, ঠিক একটা দস্তানার মতো। লোমগুলো সব সাদা হয়ে গেছে, গায়ের রঙ সবুজ। তার চোখ বলতে কিছু নেই। আমি তো ভয়ে চিৎকার করে উঠি! আর তখন মা আমাকে এমন পিটুটি দেয়! মা বলে, তাকে দেখে কিছুতেই চেঁচানো চলবে না, সে যেন কিছুতেই ভয় না পায়! তাহলে সে রেগে গিয়ে বাড়ি ছেড়ে একেবারেই চলে যাবে—আর তা হবে খুবই খারাপ ব্যাপার! যে বাড়িতে ব্রাউনি নেই, ভগবান সে বাড়ির মঙ্গল করেন না। আচ্ছা, ব্রাউনি কে, তুমি জান?'

'না, কে বলো তো?'

'ব্রাউনি ভগবানের কাছে খবর পাঠায়। দেবদূতরা তার কাছ থেকে খবর শুনে ভগবানের কাছে গিয়ে বলে। দেবতারা আছে স্বর্গ থেকে। তারা কিন্তু মানুষের কথা বুঝতে পারে না। মানুষের কথা শুনলে তাদের পাপ হয়। আর দেবদূতদের কথাও মানুষের শোনা চলে না…'

'কেন চলে না?'

'কেন আবার, শোনার কথা নয়, তাই। আমার মনে হয়, দেবদূতদের কথা শুনতে গেলে মানুষের পাপ হবে—ভগবান রাগ করবেন।'

বলতে বলতে ও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, কথাগুলো বেরিয়ে আসছে, আরো তারাতাড়ি—সুস্থ অবস্থায় যেমনভাবে ও কথা বলে প্রায় তেমনিভাবে।

'ভগবানের কাছে নিজের কথা সরাসরি বলতে তো সবাই চায়। কিন্তু তা হবার নয়। ব্রাউনি আছে যে! এমনও হতে পারে, ব্রাউনি কারও ওপরে ভয়ানক খেপে গেছে—হয়তো লোকটির কোনো একটা কাজ ব্রাউনির পছন্দ হয়নি। তখন ব্যাপারটা হবে কি জানো, দেবদূতদের কাছে গিয়ে সে একঝুড়ি বানানো কথা বলবে। বুঝতে পারলে ব্যাপারটা? তখন দেবদূতরা তাকে জিগ্যেস করবে, 'ওই লোকটার খবর কি?'

থে তো লোকটার ওপরে চটে আছে, তাই বলবে, 'লোকটা খারাপ'—বাথ্ আর দেখতে হবে না, তারপর থেকে লোকটা খালি বিপদের মধ্যে পড়বে। পড়তেই হবে। মানুথ তো অনবরত বলেই চলেছে—প্রভু কৃপা করো! কিন্তু তারা জানতে পারে না, তার কাছে তাদের সম্পর্কে কী বলা হয়েছে, তাদের কথা থে শুনতে চায় না—থেও রেগে গেছে···'

ছেলেটির মুখটা থমথমে আর গম্ভীর হয়ে উঠেছে। চোখদুটোকে ঘোঁচ করে সিলিংয়ের দিকে সে তাকাল। শীতকালের আকাশের মতো ধূসর সিলিং ; ভিজে ভিজে দাগগুলোকে দেখাচ্ছে মেঘের মতো।

'তোমার বাবা কি ভাবে মারা গেছেন ?'

'ক্ষমতার বড়াই করতে গিয়ে। জেলে থাকার সময়ে ব্যাপারটা ঘটে··· আমার বাবা বড়াই করেছিল যে পাঁচ-পাঁচটি থত্যিকারের লোককে বাবা তুলে ধরতে পারে। পাঁচজন লোককে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বাবা বলল, একজন আরকজনকে যেন জড়িয়ে ধরে থাকে। তারপর বাবা গেল পাঁচজন লোককে তুলে ধরতে। বাথ, বাবার বুকের কল্জে ফেটে গেল। রক্ত ঝরে ঝরে মারা গেল বাবা।'

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে 'ঝুমঝুম' আবার শুয়ে পড়ল আমার পাশটিতে। তারপর গরম গালটা হাতে ঘষতে ঘষতে বলে চলল :

'আমার বাবার গায়ে ছিল ভয়ানক জোর! বাবার গায়ের জোর দেখে অবাক হয়ে যেত থবাই! একমণি বোঝা নিয়ে একবারও না থেমে এক কুড়ি চার বার বাবা পার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হলে কি হবে, বাবার কোনো কাজ ছিল না। জমি যেটুকু ছিল তাও না থাকারই মতো··· ঠিক কতটুকু জমি ছিল তা আমি বলতে পারব না। ঘরে আমাদের কিছু খাবার থাকত না, একেবারে কিচ্ছু না। শুধু লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষে করো! আমি তখন খুবই ছোট—কিন্তু আমিও ভিক্ষের বার হতাম। তাতারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতাম। আমাদের ওখানে মানুথ বলতে থবাই ছিল তাতার। কিন্তু ভারি ভালো লোক ছিল তারা। কাউকে ফিরিয়ে দিত না। থবাই ভালো ছিল। কিন্তু আমার বাবা আর কী করবে ?

আর কোনো উপায় না দেখে বাবা ঘোড়া চুরি করতে আরম্ভ করল···
আমাদের জন্তে বাবার খুব কথ্‌টো হয়েছিল···'

ছেলেটির সরু গলা ভারী হয়ে উঠেছে! গলার স্বরটাকে শোনাচ্ছে ক্লান্ত আর ভাঙা ভাঙা। বুড়ো মানুষের মতো খক্‌ খক্‌ করে কাশছে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

'বাবা এক একবার ঘোড়া চুরি করে আনে, তারপর কিছুদিন আমাদের আর কোনো ভাবনা থাকে না। দিব্যি খাওয়া দাওয়া চলে।···মা কিন্তু কাঁদে, কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করে ফেলে···তবে মাও মাঝে মাঝে খাওয়াদাওয়া করত আর গান গাইত···মা ছিল আমাদের ছোট্টখাট্টো মানুষ···খব বিথয়ে মা ছিল খুব ভালো···মাঝে মাঝে বাবার কাছে মা কাঁদত—ওগো, তোমার কী উপায় হবে গো!···চাথীরা বাবাকে লাঠি দিয়ে মারত—বাবা কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করত না! কথা ছিল আমার দাদা আর্তেম যাবে থৈন্তদলে··· আমরা ভাবতাম থৈন্যদলে গেলে দাদা মথ্‌তো মানুষ হবে···কিন্তু দাদাকে থৈন্যদলে নিল না···'

প্রচণ্ড একটা ঘড় ঘড় আওয়াজ তুলে ছেলেটি চুপ করে গেল। চমকে উঠলাম আমি। ঝুঁকে পড়ে ওর বুকের স্পন্দন শুনতে চেষ্টা করলাম। বুকের স্পন্দন দুর্বল ও দ্রুত। কিন্তু জ্বর কিছুটা কমেছে মনে হয়।

জানলা দিয়ে একফালি পাণ্ডুর চাঁদের আলো এসে পড়েছে নোংরা মেঝের ওপরে। বাইরেটা নিস্তব্ধ ও পরিষ্কার। ঝকঝকে আকাশ। সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখবার জন্তে এবং তুষারজড়ানো বাতাসে শ্বাস নেবার জন্তে আমি উঠোনে বেরিয়ে এলাম।

তাজা ও হিম শরীর নিয়ে যখন আমি আবার বাইরে থেকে কারখানা-ঘরে ফিরে এলাম—তখন আমাকে আঁতকে উঠতে হল। ছাই-ছাই রঙের প্রায় নিরবয়ব একটা জীবন্ত বোঁচকা চুল্লির পাশে অন্ধকারে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে আর খুব আলতোভাবে টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে।

চমকে উঠে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কে ওখানে ?'

শোনা গেল মনিবের পরিচিত গলার স্বর। ভাঙা ভাঙা গলায় মনিব বলল, 'চেঁচিও না!'

গায়ে সেই চিরাচরিত তাতার-শার্ট। এই জামাটা গায়ে দিলে মনিবকে বুড়ী স্ত্রীলোকের মতো দেখায়। মনিব দাঁড়িয়ে আছে চুল্লির পিছনদিকে একটা কোণে, ; চোরের মতো হাবহাব, একহাতে একটা ভদ্‌কার বোতল, অপর হাতে একটা গামলা। মনে হয় তার হাতদুটো কাঁপছে—শোনা যাচ্ছে গ্লাসের ঠুন-ঠুন আর মদ ঢালার গব্‌ গব্‌ আওয়াজ।

এগিয়ে যেতেই মনিব আমাকে ডাকল। হাতের গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরেছে, খানিকটা মদ চল্‌কে পড়ে গেছে মাটিতে। বলল, 'নাও হে, গলাটা একটু ভিজিয়ে নাও!'

'দরকার নেই।'

'কেন ? দরকার নেই কেন ?'

'এখন মদ খাবার সময় নয়।'

'মদ খাবার আবার সময় অসময় আছে নাকি! সব সময়েই চলতে পারে। নাও, খেয়ে নাও।'

'না মদ আমি খাই না।'

'কিন্তু আমি যে শুনেছিলাম তুমি খাও।'

'খাই খুব সামান্য পরিমাণে—শরীর যদি খুব ক্লান্ত লাগে তাহলে…'

ডান চোখ দিয়ে গ্লাসের ভিতরটা সে একবার দেখে নেয়, ফোঁস করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, তারপর গ্লাসের ভদ্‌কা ছপাৎ করে ছুঁড়ে ফেলে চুল্লির গর্তের মধ্যে। তারপর কয়েক পা এগিয়ে এসে চুল্লির গর্তের মধ্যে পা ঝুলিয়ে বসে মেঝের ওপরে।

'বোসো, তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

অন্ধকারে মনিবের চ্যাটালো মুখটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু তার গলার স্বরটা অস্বাভাবিক রকমের অপরিচিত ঠেকছে। প্রচণ্ড একটা কৌতূহল নিয়ে আমি বসি তার পাশটিতে। মনিব বসে আছে মাথা

নিচু করে, তাল দেবার মতো করে গ্লাসের ওপরে আঙুল বাজাচ্ছে, অস্পষ্ট একটা ঠুন-ঠুন শব্দ হচ্ছে গ্লাসটা থেকে।

'আচ্ছা এবার তুমি যা-হোক কিছু বলো…'

'ইয়াশ্‌কাকে হাসপাতালে না নিয়ে গেলে চলবে না…'

'কেন, কি হয়েছে ?

'ওর অসুখ করেছে। কুজিন প্রচণ্ড মার দিয়েছে ওকে।'

'এই কুজিনটা হচ্ছে পাজির পা-ঝাড়া। দিনরাত খালি সবার নামে আমার কাছে লাগাতে আসে। তুমি কি ভাব, এজন্যে আমি ওকে বেশি পছন্দ করি, বা ও কিছু বাড়তি পয়সা পায় ? কিচ্ছু না, আর পয়সা তো দূরের কথা, ও ব্যাটার হতকুচ্ছিৎ মুখটার মধ্যে একমুঠো ধুলো ফেলতেও আমি রাজি নই…'

কথা বলছে টেনে টেনে আলস্যের সঙ্গে। কিন্তু কথাগুলো স্পষ্ট। আর যদিও কথার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্‌কার গন্ধ ভেসে আসছে, কিন্তু মনিবকে মাতাল বলে মনে হচ্ছে না।

'আমি সব জানি। আচ্ছা, বলো তো, তুমি কেন শুয়োরগুলোকে মেরে ফেলতে রাজি হওনি ? আমার কাছে লুকিও না, সত্যি কথা বলো। তোমাকে আমি অন্যায় শাস্তি দিয়েছি—কথাটা ঠিক। কিন্তু তুমিও যথেষ্ট অন্যায় করেছ—বলো করোনি ?

আমি সত্যি কথাই বললাম।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষকালে মনিব বলল, 'ও, এই ব্যাপার ! তাহলে আমি হচ্ছি শুয়োরের চেয়েও খারাপ—তাই না ? তাহলে আমাকেও বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা উচিত—কি বলো ?

কথাগুলো শুনে মনে হয় যেন সে হাসছে,। আমি আবার বলি :

'তাহলে কি ইয়াশ্‌কাকে কাল আমি হাসপাতালে নিয়ে যাব ?'

'হাসপাতালে নিয়ে যাও, কসাইখানায় নিয়ে যাও—যে চুলোয় খুশি নিয়ে যাও। আমার তাতে কি আসে যায় ?'

'হাসপাতালের খরচ আপনাকেই দিতে হবে।'

'কক্ষনো না!' কথাগুলো তার মুখ থেকে ফস্‌কে বেরিয়ে এসেছে, 'এমন ব্যাপার আগে কক্ষনো হয়নি। তাহলে তো সবাই হাসপাতালে শুয়ে পড়ে থাকতে চাইবে!...বাপুহে, সেদিন তুমি আমার কান মোচড়ে দিয়েছিল কেন বলো তো শুনি?'

'আমার রাগ হয়েছিল।'

'রাগ হয়েছিল—তা না হয় বুঝলাম! আমি সেকথা জিজ্ঞেস করিনি! বেশ তো, রাগ হয়েছিল, আমার কানের ওপরে না হয় একটা চাপড় মারতে, না হয় চোয়ালে একটা ঘুষি মারতে—কিন্তু কান মোচড়ে দিলে কেন? আমি কি ছোট ছেলে!...'

'কারও গায়ে হাত তুলতে আমি অপছন্দ করি...'

অনেকক্ষণ সে নির্বাক থাকে। মনে হয় যেন তার ঝিমুনি ধরে গেছে। তারপর দৃঢ় ও স্পষ্ট স্বরে বলে:

'বেশ মজার লোক তুমি যা হোক! অন্যদের সঙ্গে তোমার কোথাও এতটুকু মিল নেই। এমন কি তোমার মুণ্ডুটা পর্যন্ত অন্য ধাঁচের...' কথাটা সরলভাবেই সে বলেছে কিন্তু তার রাগটুকু চাপা থাকেনি।

'আচ্ছা বলো তো, আমি কি সত্যিই খুব খারাপ লোক?'

'আপনার কি মনে হয়?'

'আমার মনে হয়, আমি খুব ভালো লোক—তুমি যা বলো তা বানানো কথা। বুদ্ধিশুদ্ধি আমার যথেষ্টই আছে। অবিশ্যি তুমি লেখাপড়া শিখেছ, আবোল-তাবোল কথা বানাবার ক্ষমতা তোমার আছে, খুশিমতো যে কোনো বিষয়ে কথা বলে যেতে পার—তা সে তারার কথাই হোক বা ফরাসীদের কথাই হোক বা বড়োলোকদের কথাই হোক! আর কথাগুলো শুনতে খুবই ভালো আর শুনে বেশ মজাও পাওয়া যায়—তাও ঠিক! তোমাকে যেদিন প্রথম দেখি সেদিনই তোমার ওপরে আমার নজর পড়েছিল—সেই মনে আছে তো, সেই প্রথম যেদিন তুমি এসেছিলে আর আমাকে দেখে বলেছিলে যে ঠাণ্ডা লেগে আমি মরে যাব...কোনো মানুষকে দেখে চট্ করে আমি তার সত্যিকারের দাম বুঝে নিতে পারি— এ ব্যাপারে আমার ভুল হয় না!'

থ্যাবড়া মোটা একটা আঙুল দিয়ে নিজের কপালের ওপরে সে টোকা বাজাতে থাকে, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে চলে :

'জানো, এই জায়গাটার সঙ্গে অনেকসব ঘটনা জড়িয়ে আছে! একেবারে অস্থির করে তোলে!···আমি কিন্তু সমস্ত মনে রেখেছি, আমার ঠাকুর্দার ক-গাছা দাড়ি ছিল তাও আমি বলে দিতে পারি। আচ্ছা, চলে এসো, তোমার সঙ্গে একটা বাজি রাখি—কি বলো রাজি আছ?'

'কিসের বাজি?'

'বাজিটা হবে এই নিয়ে যে তোমার চেয়ে আমি বেশি চালাকচতুর। আচ্ছা, তুমি নিজেই ভেবে দেখ। আমি একটা মুখ্যু মানুষ, অ-আ-ক-খ জানি না, শুধু জানি এক-দুই গুণতে। কিন্তু তবুও আমি কত বড়ো একটা ব্যবসা চালাচ্ছি দ্যাখ! তেতাল্লিশ জন লোক কাজ করে, একটা কারখানা, তিনটে শাখা। তুমি লেখাপড়া শিখেছ, তবুও তোমাকে আমার কাছে কাজ নিতে হয়েছে। ইচ্ছে হলেই এক্ষুনি তোমাকে আমি লাথি মেরে বার করে দিতে পারি—আর তোমার জায়গায় সত্যিকারের একজন ছাত্রকে কাজে নিতে পারি। শুধু তোমাকে কেন, ইচ্ছে হলে এখানকার সবাইকেই আমি লাথি মেরে বার করে দিতে পারি, তারপর সমস্ত বিক্রি-টিক্রি করে দিয়ে মদ খেয়ে উড়িয়ে দিতে পারি সমস্ত টাকা। কি বলো, এবার বিশ্বাস হচ্ছে?'

'এসব করবার জন্যে মাথার দরকার হয় বলে তো আমার মনে হয় না···'

'তুমি হাসালে দেখছি! মাথা কাকে বলছো তুমি? আমার যদি মাথা না থাকে জগৎসংসারে কারও তাহলে মাথা নেই! তুমি কি মনে করো, কথা বলতে পারলেই মাথার পরিচয় দেওয়া হয়? বাপু হে, মাথার পরিচয় পাওয়া যায় ব্যবসার মধ্যে···ব্যবসাই হচ্ছে একমাত্র জায়গা যেখানে মাথার দরকার হয়···'

নিঃশব্দে সে হাসছে। ভঙ্গিটা এমন যেন এটা একটা অবধারিত কথা। হাসির সঙ্গে সঙ্গে দুলে উঠছে প্রকাণ্ড থলথলে শরীরটা। এমনিভাবে সে কথা বলে চলে; ইতরজনের প্রতি অনুকম্পার সুর আসে তার কথায়, মদের নেশায় জড়িয়ে জড়িয়ে আসে গলার স্বর।

'একটা লোককে খাওয়াবার ক্ষমতাও তোমার নেই—আর আমি খাওয়াচ্ছি চল্লিশজনকে! ইচ্ছে করলে আমি একশোজনকে খাওয়াতে পারি! হুঁঃ, আর আমার কাছে কিনা তুমি মাথার বড়াই করতে এসেছ!'

তার গলার স্বরটা হয়ে উঠেছে কঠোর! মুরুব্বির মতো সে কথা বলে চলেছে। আর যতোই সে কথা বলে ততোই তার জিভটা ভারী হয়ে আসে।

'আমার পিছনে তুমি লেগেছ কেন বলোতো? কোনো অর্থ হয় না! এতে কোনো দিক দিয়েই তোমার কিছু লাভ নেই—কোনো দিক দিয়ে তোমার কিছু ভালও হবে না। বরং উঠে পড়ে চেষ্টা করো, যাতে তোমার যতোটা পাওয়া উচিত তা আমি তোমাকে দিই…'

'আপনি তা দিতে বাকি রাখেননি।'

'তাই নাকি?'

চিন্তাগ্রস্ত মুখে কিছুক্ষণ সে চুপ করে থাকে, তারপর সায় দেবার ভঙ্গিতে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে:

'তাই বটে! এখন তোমার আর যেটুকু দরকার তা হচ্ছে আমার কাছ থেকে একটা সুযোগ পাওয়া—কিন্তু এই সুযোগটুকু আমি হয়তো তোমাকে নাও দিতে পারি…অবিশ্যি আমার চোখে কিছুই এড়ায় না, সবই আমি টের পাই! এই যে গারাস্‌কার কথাই ধরো, লোকটা হচ্ছে চোর। তবে এই লোকটাও খুব চালাকচতুর, ওকে যদি টিট করা না যায় আর জেলে পোরা না যায়—তাহলে ও-ই হয়ে বসবে মনিব! তখন ও জ্যান্ত মানুষের চামড়া ছাড়িয়ে নেবে! এখানে সবাই চোর, পশুরও অধম সবাই—ভাগাড়ের পচা মাংসের মতো! আর তুমি কিনা চাও তাদেরই সঙ্গে ভালোমানুষি করতে… আমি তো এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না—এটা তোমার পক্ষে মস্ত একটা বোকামির পরিচয়।'

ভীষণ ঘুম পাচ্ছে আমার। সারাদিনের পরিশ্রমের পর টনটন করছে আমার শরীরের হাড় ও পেশী। ক্লান্তিতে ঝিমঝিম করছে মাথা। মনিবের সেই একঘেয়ে বকরকানি শুনতে শুনতে চিন্তাশক্তি লোপ পেয়ে গেছে যেন।

'আর মনিবদের সম্পর্কে কী ভয়ানক সব কথা যে বলো তুমি!

তোমার বয়েস কম তাই এমন বোকার মতো কথা তোমার মুখে আসে। আমি না হয়ে অন্ত কেউ হলে সরাসরি পুলিস ডেকে বসত। তারপর পুলিসের হাতে একটা রুবল গুঁজে দিয়ে এমন একটা ব্যবস্থা করত যাতে তোমার হাজত-বাস পাকা হয়।'

নরম ভারী হাতে আমার উরুতে সে একটা চাপড় মারে।

'চালাক মানুষ কক্ষনো বেসামাল হয় না। সে চেষ্টা করে কি করে সে নিজেও একসময়ে মনিব হয়ে বসতে পারে। মানুষ তো আছে শ্যাওলার মতো, মনিব ক'জন তা হাতে গোণা যায়। এজন্তেই তো চারদিকে এত গণ্ডগোল··· গোটা ব্যাপারটাই উল্টো আর ভণ্ডুল হয়ে গেছে! যদি তুমি খোলা চোখে তাকাতে পার তাহলে আরো অনেক কিছু দেখতে পাবে—তখন তোমার মনটাও হয়ে উঠবে অনেক বেশি শক্ত, আর তখন বুঝতে পারবে, এই যে সাধারণ মানুষগুলো—এই যারা কাজ পায় না—তারাই হচ্ছে যতো নষ্টের গোড়া। এইসব বাড়তি লোকগুলোকে কাজে লাগাতে হবে যাতে তারা নিষ্কর্মার মতো টুঁ মেরে মেরে বেড়াতে না পারে। এমন কি একটা গাছকেও যদি কোনো কাজে না লাগিয়ে পচতে দেওয়া হয়—তবে সেটা একটা লজ্জার ব্যাপার। গাছটাকে পোড়াও—উত্তাপ পাবে। মানুষ সম্পর্কেও একই কথা। বুঝতে পারলে?'

ইয়াশকা ককিয়ে উঠেছে। ওকে দেখবার জন্মে আমি উঠে যাই। চিত হয়ে ও শুয়ে আছে; টান হয়ে আছে ভুরুদুটো, মুখটা খোলা, হাতদুটো শরীর বরাবর মেলে দিয়েছে। ছেলেটির মধ্যে কোথায় যেন সৈনিকোচিত একটা ঋজুতা আছে।

বাক্সের ওপর থেকে নিকান্দের লাফিয়ে নেমে পড়েছিল, তারপর চুল্লির দিকে ছুটে আসতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মনিবের গায়ের ওপরে। মনিবকে দেখে সে তো থ', হাঁ হয়ে গেছে মুখটা, অপরাধীর মতো পিটপিট করছে কুচুটে চোখদুটো। তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে একটা বোবা গোঙানি, হাতের চঞ্চল আঙুলগুলো শূন্তে একটা জটিল আল্পনা আঁকে।

'মু-উ-উ-উ!' তার গোঙানিকে অনুকরণ করে মনিব তাকে ভেঙচি কাটে, তারপর বেরিয়ে চলে যায়। বেরিয়ে যেতে যেতে বলে, 'জড়দগব···'

মনিব বাইরে চলে যেতেই বোবা কালা লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টেপে, তারপর দু-হাতে নিজের গলাটা আঁকড়ে ধরে অনেক কষ্টে খানিকটা আওয়াজ বার করে :

'খক্···খক্···'

পরদিন সকালে ইয়াশকা আর আমি গেলাম হাসপাতালে। গাড়ি ভাড়া করবার পয়সা ছিল না। হেঁটে যেতে খুবই কষ্ট হয়েছে ছেলেটির; দুর্বল শরীরে কেশেছে আর কথা বলেছে। তবুও শরীরের যন্ত্রণাকে পুরুষের মতো সহ্য করবার চেষ্টা করছে সব সময়ে।

'আমি আর একেবারেই দম নিতে পারছি না···আমার বুকের ভিতরটা গুঁড়িয়ে গেছে···কী কাণ্ড···'

রাস্তায় ঝকঝকে রূপোলী সূর্যের আলো। গরম পোশাকে মুড়ি দিয়ে পথচারীরা চলেছে। আর ও চলেছে ছেঁড়া নোংরা জামাকাপড় পরে, ওকে দেখাচ্ছে আরো ছোট, আরো হাড়-জিরজিরে—সত্যিকারের ও যা, তার চেয়েও। কারখানা-ঘরের অন্ধকারে অভ্যস্ত ওর আসমানী রঙের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে দর দর করে।

'আমি মরে গেলে আর্তেম গোল্লায় যাবে। বোকার মতো মদ খেতে আরম্ভ করবে। ওর কি আর কোনো দিকে হুঁশ আছে, না, নিজের কথা ও ভাবে! বকবকম মহারাজ, তুমি ওকে মাঝে মাঝে ধমকে দিও···বোলো যে আমি এই কথা বলেছি···'

ওর শুকনা কালো ঠোঁটদুটো যন্ত্রণায় বেঁকে গেছে, শিশুর মতো চিবুকটা কাঁপছে। আমি ওকে বগলের তলায় চেপে ধরি। আমার ভয় হচ্ছে যে ও হয়তো কাঁদতে শুরু করবে আর ওকে কাঁদতে দেখলে আমি হয়তো পথচারীদের মারধোর করে জানলার কাচ গুঁড়িয়ে একটা বিশ্রী কাণ্ড বাধিয়ে তুলব।

'ঝুমঝুম' দাঁড়িয়ে পড়ে, টেনে টেনে শ্বাস নেয়, তারপর ঠিক একজন বয়স্ক লোকের মতো প্রতিটি কথায় জোর এনে বলে :

'ওকে বলবে যে আমি হুকুম দিয়েছি ও যেন তোমার কথা মেনে চলে…'

কারখানায় ফিরে আরেকটা দুর্ঘটনার কথা শুনতে হল। সকালবেলা নিকান্দের একটা শাখা দোকানে বিস্কুট নিয়ে যাচ্ছিল ; রাস্তায় সে দমকলের ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়েছে। এখন সে হাসপাতালে।

ছোট ছোট সরু চোখের দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে বেশ ভারিক্কী চালে শাতুনভ বলে, 'দেখে নিও, বার বার তিনবার না হয়ে যায় না। দুটো হয়েছে, আরেকটা খারাপ খবর শুনতে হবে আমাদের। হতেই হবে তিনটে—যেমন হয়েছে, যীশুখ্রীস্ট, সেন্ট নিকোলাস, সেন্ট জর্জ। তখন আমাদের মেরীমাতা বলবেন, 'বাস্ বাস্ বাছারা যথেষ্ট হয়েছে!' সেকথা শুনে হুঁশ ফিরে আসবে তাদের…'

তারপর নিকান্দেরের কথা বিশেষ কেউ বলে না। নিকান্দের আমাদের দলের লোক নয়। সে কাজ করে অন্য জায়গায়। তবে নিকান্দেরের কথা না হলেও তুমুল আলোচনা চলে দমকলের ঘোড়াগুলোকে নিয়ে। জানা যায় যে এই ঘোড়াগুলোর যেমন ক্ষমতা, তেমনি দম, তেমনি বেগ।

খাবার সময়ে এল পারাস্কা। চটপটে সুন্দর ছেলেটি, লম্পট ও চোরের মতো বেপরোয়া ভাব চোখের দৃষ্টিতে ; কিন্তু যাদের ভয় করে তাদের কাছে একেবারে কেঁচো। ঘরে ঢুকেই সে গুরুগম্ভীরভাবে ঘোষণা করল যে নিকান্দেরের জায়গায় আমাকে সহকারী পোড়ানী-মিস্ত্রী করা হয়েছে মাইনে মাসে ছ' রুবল।

'বেশ, বেশ।' খুশি হয়েই পাশ্‌কা আমাকে অভিনন্দন জানায় ; পরক্ষণেই ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, 'এটা কার হুকুম ?'

'মনিবের।'

'মনিব তো মাতাল হয়ে পড়ে আছে।'

'মোটেই না!' খিক্‌খিক্ করে হেসে পারাস্কা পালটা জবাব দেয়, 'গত-কাল অবশ্য মনিব অশৌচ করেছে—কিন্তু আজ তো মনিব একেবারে

স্বাভাবিক অবস্থায়, বরং স্বাভাবিকের চেয়েও একটু বেশি সজাগ যেন। ময়দা কিনতে বেরিয়েছে…’

‘তার মানে শুয়োরের ব্যাপারটা এখনো মেটেনি’, আস্তে আস্তে আর চিবিয়ে চিবিয়ে জিপ্‌সি বলে।

সবাই আমার দিকে গোমড়া মুখে তাকিয়ে আছে। তাদের চাউনিতে হিংসা আর উৎকট রকমের অবজ্ঞা। চারদিক থেকে ভেসে আসছে কর্কশ ও জঘন্য সব মন্তব্য।

‘ব্যাটা ঠিক জায়গায় ঘাই মারতে জানে…’

‘আরে ভাই, পরদেশী চিড়িয়া কখনো ভোল পালটায় না।’

শাতুনভের কতকগুলি প্রিয় কথা আছে। সেই কথাগুলিই সে এবার খুব আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে :

‘ফণিমনসা গাছও যেমন আছে তেমনি আছে পোস্তগাছ…’

কুজিন নিজের চিন্তাকে ঢেকে রাখে অন্য কতগুলি কথার মধ্যে। যখনই কোনো কিছুকে সে বরদাস্ত করতে পারে না, তখনই তার মুখে শোনা যায় এই কথাগুলো :

‘হতচ্ছাড়ারা, ঠাকুরের মূর্তিকে একটু পরিষ্কার করবার কথাটা কতবার তোদের বলতে হবে শুনি!’

একমাত্র আর্তেম চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছে ;

‘এই শুরু হল!—এবার চলবে খেয়োখেয়ি আর দাঁতখিঁচুনি!’

রুটির কারখানায় আমার কাজের প্রথম রাত্রিতেই হঠাৎ মনিবের আবির্ভাব হল। আমি তখন সবেমাত্র একদফা ময়দা মাখা শেষ করে পরের দফায় জল ঢেলেছি এবং সেই ফাঁকে একটা বই হাতে নিয়ে বসেছি একটা বাতির তলায়—ঠিক এমনি সময় ঘুম-ঘুম চোখদুটো পিটপিট করতে করতে আর ঠোঁট চাটতে চাটতে মনিব এসে হাজির।

‘কী, পড়া হচ্ছে বুঝি? ভালো ভালো। ঘুমনোর চেয়ে পড়া ভালো—অন্তত ময়দাটা বেশিক্ষণ জলে ভিজবার ভয় থাকে না—’

শান্ত স্বরে সে কথা বলছে। টেবিলের তলায় পোড়ানী নাক ডাকিয়ে

ঘুমোচ্ছিল, সেদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে আমার পাশে একটা ময়দার বস্তার ওপরে বসে। আমার হাত থেকে বইটা নেয়, বইটাকে বন্ধ করে, তারপর নিজের মোটা উরুর ওপরে বইটাকে রেখে হাত দিয়ে চাপা দেয়।

'কী বই এটা?'

'এই বইতে রাশিয়ার মানুষদের কথা লেখা আছে।'

'কোন্ মানুষদের কথা?'

বললাম তো—রাশিয়ার মানুষদের কথা।'

আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মুরুব্বির মতো স্বরে সে বলে, 'আমরা কাজানদেশের লোকরাও হচ্ছি রাশিয়ান। শুধু তাতাররা রাশিয়ান নয়। সিমবির্স্কের মানুষরাও রাশিয়ান। এ বইতে কাদের কথা লেখা আছে?'

'সবার কথা—'

বইটা খোলে সে; হাতটাকে টান করে মেলে দিয়ে চোখের সামনে ধরে থাকে। মাথা নাড়ে আর সবুজ চোখটা দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে পৃষ্ঠাগুলো। তারপর সরাসরি মন্তব্য করে:

'বেশ বোঝা যাচ্ছে, তুমি এই বইটা পড়ে কিচ্ছু বুঝতে পারনি।'

'কী করে বোঝা গেল?'

'সহজেই বোঝা যায়। বইয়ে ছবি কই? একটিও ছবি নেই। বই যদি পড়তে হয় তো ছবিওলা বই পড়বে—ছবিওলা বই পড়েই বেশি মজা পাওয়া যায়, এই হচ্ছে আমার কথা! তা, এই বইতে মানুষদের সম্পর্কে কী কথা লেখা আছে?'

'লেখা আছে তাদের বিশ্বাসের কথা, তাদের আচার ব্যবহারের কথা, তারা যে-সব গান গায়…'

কথার মাঝখানেই মনিব বইটা বন্ধ করে উরুর তলায় চেপে রেখেছে। তারপর কোলাব্যাঙের মতো মস্ত হাঁ করে লম্বা একটা হাই তোলে। হাই তোলবার সময়ে কিন্তু মুখের সামনে ক্রুশচিহ্ন আঁকে না।*

* হাই তোলবার সময়ে যাতে কোনো দুষ্ট আত্মা মুখের মধ্যে ঢুকে যেতে না পারে সেজন্যে ক্রুশচিহ্ন আঁকা হয়—এটা একটা কুসংস্কার।

সে বলে, 'এসব কথা তো সবাই জানে। মানুষ বিশ্বাস করে ভগবানে, তাদের মধ্যে ভালো গানও আছে, খারাপ গানও আছে, আর তাদের মধ্যে আছে কতগুলি পচা আচার ব্যবহার। তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করো না কেন, যে-কোনো বইয়ের চেয়ে ভালোভাবে আমি এসব আচারব্যবহারকে দেখিয়ে দিতে পারি। এজন্যে বই পড়বার দরকার হয় না। যে-কোনো একটা রাস্তা ধরে এগিয়ে যাও, গিয়ে ওঠো কোনো একটা বাজারে বা সরাইখানায় বা ছুটির দিনের গাঁয়ে—সব জায়গাতেই তুমি আচারব্যবহার দেখে আসতে পারবে। কিংবা যেতে পার কোনো একটা এজলাসে বা টহলদারী আদালতে···

'আপনি ভুল বিষয়ে কথা বলছেন।'

গোমড়া মুখে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'আমি কোন্ বিষয়ে কথা বলছি তা আমি ভালোভাবেই জানি! এই বইগুলির কথা যদি বলতে হয়—এগুলো হচ্ছে নেহাতই বানানো গল্প, রূপকথা, শুধু মেকি ঝলক। তুমি কি বলতে চাও যে একটি মাত্র বইয়ে মানুষদের কথা লেখা যায়?'

'আরো অনেক বই আছে।'

'তা থাকুক গে! মানুষ তো আছে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ। প্রত্যেক মানুষকে নিয়ে এক-একটা বই কিছুতেই লেখা যেতে পারে না।'

তার গলার স্বরে অসহিষ্ণুতাকে টের পাওয়া যায়। চোখের ওপরে হলদে লোমগুলো যেন রাগে খাড়া হয়ে উঠেছে। এই কথাবার্তা আমার কাছে মনে হচ্ছে একটা অপ্রিয় স্বপ্নের মতো এবং বিরক্তিকর।

ফোঁস ফোঁস করে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে সে বলে, 'তুমি ভারি মজার লোক দেখছি। তোমার মাথার মধ্যে সমস্ত কিছু ঘুলিয়ে গেছে। তুমি নিজে কি বুঝতে পার না, এসব হচ্ছে ফক্কিকারি কথাবার্তা, মস্ত একটা ধাপ্পা! বইগুলোতে কাদের সম্পর্কে লেখা হয়েছে? না, মানুষদের সম্পর্কে। কিন্তু এমন কোন্ মানুষ আছে যে নিজের সম্পর্কে সত্যি কথা বলবে? তুমিই বলো না, তোমাকে জিজ্ঞেস করা হলে তুমি বলবে? নাকি আমি বলব! তুমি যদি জ্যান্ত অবস্থায় আমার ছাল ছাড়িয়ে নাও, তাহলেও আমি বলব

না! 'এমন কি হয়তো ভগবানের সামনে গিয়েও আমি কিছুই বলব না! ভগবান বলবেন, আচ্ছা ভাসিলি, বলো তো শুনি তুমি কি কি পাপ করেছ? আমি বলব, প্রভু, আমার চেয়ে সে কথা তো আপনারই ভালো জানবার কথা, কারণ আমার আত্মা তো আমার নয়, আপনার!'

কনুই দিয়ে আমাকে একটা গুঁতো দিয়ে খিক্‌খিক্ করে হেসে আর চোখ টিপে আরো চাপা স্বরে সে বলে চলে:

'একথা অনায়াসেই বলা বলে! কার আত্মা রয়েছে আমাদের মধ্যে? ভগবানের! তাঁর জিনিস তিনিই নিয়েছেন—বাস, আর কোন কথাই থাকতে পারে না!'

একটা ক্রুদ্ধ হুঙ্কার বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে, হাতের তালু দিয়ে এমনভাবে মুখ ঘষতে থাকে যেন মুখ ধুচ্ছে, আর তেমনি অব্যাহত উৎসাহে বলে চলে:

'আচ্ছা, তুমিই বলো! আত্মা কি সে দেয়নি? নিশ্চয়ই দিয়েছে! আর আত্মা কি সে ফিরিয়ে নেয়নি? নিশ্চয়ই নিয়েছে! তাহলে আর দেনা পাওনা কিছুই থাকে না—সব শোধবোধ!'

ভাবি অদ্ভুত লাগছে আমার। আলোটা ঝুলছে আমাদের পিছনদিকে মাথার ওপরে, আর আমাদের ছায়াটা পড়েছে আমাদের পায়ের কাছে মেঝের ওপরে। মাঝে মাঝে মনিব মাথা ঝাঁকিয়ে ওঠে আর তখন হলদে আলো এসে পড়ে তার মুখের ওপরে। সে-অবস্থায় ছায়াসমেত নাকটাকে আরো লম্বা দেখায়, চোখের নিচে কালো কালো দাগ ফুটে ওঠে। আর সব মিলিয়ে থলথলে মুখটা বীভৎস হয়ে ওঠে। আমাদের ডানদিকের দেওয়ালে আছে একটা জানলা, প্রায় আমাদের মাথার সমান উঁচু, ময়লা শার্সির ভিতর দিয়ে আমি শুধু দেখতে পাচ্ছি নীল আকাশ আর একঝাঁক মটরদানার মতো ছোট ছোট হলদে তারা। পোড়ানীর সমানে নাক ডেকে চলেছে; লোকটার এমনিতে বুদ্ধিশুদ্ধি কম আর কুঁড়ে প্রকৃতির। আরশোলাগুলো খস-খস শব্দ করছে। শোনা যাচ্ছে ইঁদুরের কিঁচ-কিঁচ।

'কিন্তু আপনি কি ভগবানে বিশ্বাস করেন?' আমি মনিবকে প্রশ্ন করি। মনিব তার মরা চোখটা দিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, বহুক্ষণ কোনো কথা বলে না।

'এ ধরনের প্রশ্ন তুমি আমাকে করতে পার না। খবরদার বলছি, শুধু নিজের কাজের বিষয় ছাড়া আর কোনো বিষয়ে আমাকে কোনো প্রশ্ন করবে না। প্রশ্ন করতে পারি এক আমি, তোমাকে যা খুশি প্রশ্ন করতে পারি—তোমাকে তার জবাব দিতেই হবে। তোমার মতলবটা কী?

'মতলব যাই হোক না কেন!'

নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে সে মুখখানাকে থমথমে করে তোলে।

'এটা কী ধরনের জবাব হল? মুখফোড় শয়তান···'

উরুর তলা থেকে বইটা টেনে নিয়ে চটাং করে উরু বাজায়, তারপর বইটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় মেঝের ওপরে।

'কথা! কথা শুনতে চাও? কে জানবে আমার কথা? তোমার আছে কিছু বলবার মতো কথা? কিচ্ছু নেই···কোনো কালে হবেও না!'

কথাটা বলে সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠেছে। আত্মসন্তুষ্টির হাসি। আর তেমনি একটা অদ্ভুত শব্দ, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার মতো, অস্পষ্ট ও মৃদু—শব্দটা শুনে মনের ভিতরটা হা-হা করে ওঠে, আর একটা অনুকম্পা জাগে লোকটির জন্যে। ওদিকে মস্ত শরীরটা দুলিয়ে দুলিয়ে, হিংস্র ও কুটিল স্বরে সে কথা বলে চলেছে :

'এসব ব্যাপার আমার জানা! তোমার মতো লোক আমি আগেও দেখেছি। আমার এক শাখা-দোকানের মেয়ে-কর্মচারীকে আমি বাড়িতে এনে রেখেছি; তার একটি ভাইপো আছে। ভাইপোটি পশুবিজ্ঞানের ছাত্র; গোরু-ঘোড়ার অসুখ কি করে সারাতে হয় তাই শেখে। এখন সে একটা আস্ত মাতাল। আমিই তার এই হাল করেছি! তার নাম হচ্ছে গাল্‌কিন। মাঝে মাঝে সে আসে ভদ্‌কা গিলবার জন্যে দশটা কোপেক নিতে—একেবারে গোল্লায় গেছে সে। তারও এক সময়ে ঝোঁক চেপেছিল,

সমস্ত ব্যাপার তলিয়ে বুঝবে। মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলত—'মানুষের মধ্যেই যে-ভাবে হোক সত্য আছে—আমার আত্মা চায় এই সত্যকে খুঁজে বার করতে—তাহলে নিশ্চয়ই আত্মার বাইরেও সত্য আছে!' আর আমি করতাম কি, অনবরত তাকে মদ খাইয়ে মাতাল করে রাখতাম। এখন হতভাগাটা একেবারে বদ্ধ মাতাল। পাখির চোখের মতো চোখ মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সে আমার দিকে—ভারি নরম সেই চোখদুটি, মেয়েলোকের চোখের মতো। সেই চোখের মধ্যে কোনো রকম কুচুটেপনা ছিল, তা আমি বলব না। লোকটা বেসামাল হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে সে চিৎকার করে উঠত, 'ভাসিলি সেমিয়োনভ, মানুষ ঠকাতে তুমি ওস্তাদ, বড়ো ভয়ংকর লোক তুমি···"

চুল্লিতে আগুন দেবার সময় হয়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে মনিবকে একথা বলতেই মনিবও উঠে দাঁড়ায়; বাক্সের ঢাকনাটা খোলে, চাপড় মেরে মেরে মেরে ময়দার লেইটা পরখ করে, তারপর বলে:

'তাই বটে···'

তারপর আমার দিকে একবারও না তাকিয়ে গজেন্দ্রগমনে বাইরে চলে যায়।

আমি স্বস্তি বোধ করি কারণ লোকটির দাম্ভিক আর চটচটে গলার স্বর আর আমাকে শুনতে হবে না। লোকটির আত্মম্ভরী কথার স্রোত রুটির কারখানার বাইরে চলে গেছে।

বিস্কুটের কারখানার মেঝের ওপর দিয়ে কে যেন খালি পায়ে থপ্ থপ্ করে আসছে। তারপরেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে আর্তেম হুমড়ি খেয়ে পড়ে আমার ওপরে; মাথার চুল উস্কোখুস্কো আর বিষাদমাখা চমৎকার চোখদুটি স্বপ্নচারীর চোখের মতো বিস্ফারিত।

'দেখছ তো, তোমাকে কায়দা করবার জন্যে কি ভাবেই না মনিব চেষ্টা করছে!'

'তুমি ঘুমোওনি কেন?

'জানি না। বুকের মধ্যে কেমন যেন ব্যথা করছে···হি হি···মনিবের কাণ্ড দেখে···'

'ওর পক্ষে ব্যাপারটা একটু শক্ত বৈকি।'

'বেশ শক্ত! ঘটে কি এককোঁটা বুদ্ধি আছে···একটা সীসের চাঁই···পথ চলতে ধম্মের ষাড়!'

চুল্লির কিনারে কাঁধ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেটি হঠাৎ গলার স্বর একেবারে বদলে ফেলে নেহাতই কথার পিঠে কথা বলার মতো করে বলে :

'বেচারি ভাইটা ওদের হাতে চোট পেল···তোমার কি মনে হয় ও সেরে উঠবে, না এই ওর শেষ?'

'বলছ কি তুমি? ভগবানের দোহাই···'

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ও বিস্কুট-কারখানার দিকে পা বাড়িয়েছে। হাঁটছে শরীরটাকে কাত করে, যেতে যেতে বিষণ্ণ নরম গলায় বলে :

'ভগবানের কাছ থেকে আমাদের আশা করবার কিছু নেই..'

মনিবের সঙ্গে এইভাবে রাতের পর রাত কথা বলাটা শেষ পর্যন্ত একটা অন্তহীন দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে ওঠে। প্রায় প্রতি রাত্রেই যখন মোরগ ডেকে ওঠে, যখন নরকের শয়তানরাও একটু গড়াগড়ি দিয়ে নেয়, যখন চুল্লিতে আগুন জ্বালিয়ে একটা বই হাতে নিয়ে আমি বসি চুল্লির পাশে—তখন মনিব এসে ঢোকে রুটির কারখানায়।

গোল চেহারা, নড়তে চড়তে কষ্ট হয়। থপ্ থপ্ করে বেরিয়ে আসে নিজের ঘর থেকে আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে চুল্লির গর্তের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে। গর্তের মধ্যে দুলতে থাকে পা দুটো—যেন কবরের মধ্যে পা ঢুকিয়েছে। ক্ষুদে ক্ষুদে থাবা বাড়িয়ে দেয়, আগুনের সামনে মেলে ধরে, তারপর সবুজ চোখটাকে খোঁচ করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। হলদে হলদে চামড়ার ভিতর দিয়ে গাঢ় রক্ত চলাচল করছে—দেখে আর তারিফ করে। তারপর চলে ঘণ্টা দুয়েক ধরে এক বিশ্রী বকবকানি, যার কোনো মাথামুণ্ডু থাকে না।

সচরাচর তার কথাবার্তা শুরু হয় নিজের বুদ্ধির বড়াই দিয়ে। এতবেশি বুদ্ধি আছে বলেই না সে মুখ্যু চাষী হয়েও এতবড়ো একটা ব্যবসা গড়ে তুলতে পেরেছে; তাকে কাজ করতে হয় একদল গবেট আর ছ্যাঁচড় লোক নিয়ে—

তবুও এই ব্যবসা সে চালিয়ে যাচ্ছে। বেশ সবিস্তারেই সে নিজের সম্পর্কে বাখানি দেয়—কিন্তু তার কথার মধ্যে কেমন যেন একটু অস্থিরতা থাকে; মাঝে মাঝে থামে, মাঝে মাঝে শিস দেওয়ার মতো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। শুনতে শুনতে এক একবার মনে হয়, ব্যবসাতে সাফল্যের ফিরিস্তি দিতে দিতে সে ক্লান্ত, এসব কথা বলতে রীতিমতো কষ্ট হয় তার।

তার এমন কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা আছে, যা সত্যি সত্যিই অন্যদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়—যেমন, স্যাঁতলা-পড়া ভেজাল মেশানো ময়দা কিনতে গিয়ে দাঁও মারা, কোনো মর্দ্‌ভিনীয় ব্যবসায়ীর কাছে মন পঞ্চাশেক বাতিল বিস্কুট বিক্রি করে দিতে পারা, ইত্যাদি। এসব দেখে দেখে অনেক দিন থেকেই আমার এমন চোখ-সওয়া হয়ে গেছে যে আমি আর অবাক হই না। এই ধরনের ব্যবসাদারী কৃতিত্বের জৌলুস চাপা পড়ে যায় মানুষ-ঠকানোর একঘেয়েমিতে আর লজ্জাকর বেহায়াপনায়। মানুষ যে কত লোভী আর মানুষ যে কত নির্বোধ তা এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে নির্মমভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

চুল্লিতে গন্‌ গন্‌ করে আগুন জ্বলে; সেই আগুনের সামনে বসে থাকি আমি আর আমার মনিব। তার ভুঁড়ির পুরু ভাঁজগুলো ঝুলে পড়ে হাঁটুর ওপরে, ভাবলেশহীন মুখের ওপরে ঝিকমিক করে আগুনের লালচে আভা। কটা চোখটাকে দেখায় ঘোড়ার লাগামের ওপরে ধাতব পাতের মতো—টান টান আর তেলা তেলা, থুথুড়ে ভিখিরির চোখের মতো। আর সবুজ চোখটা বেড়ালের চোখের মতো চকচক করে; কিম্ভূত আর সজাগ একটা ছাপ পড়ার ফলে ভারি জীবন্ত মনে হয় চোখদুটোকে। গলার স্বরটা অদ্ভুত—এক একবার মেয়েদের গলার স্বরের মতো চড়া ও কোমল, এক একবার ভাঙা-ভাঙা—ক্রুদ্ধ শোসানির মতো। নির্লিপ্ত ঔদ্ধত্যের সঙ্গে কথার পিঠে কথা বলে চলে:

'সবাইকে বড়ো সহজে বিশ্বাস করো তুমি আর এমন অনেক কথা বলো যা তোমার বলা উচিত নয়! মানুষ মাত্রেই ঠগ—মুখের কথা খরচ না করে তাদের শায়েস্তা করতে হবে। কটমট করে একবার তাকাও শুধু, বাস, একটি কথা

খলাবার দরকার নেই—মুখটি বুজে থাক! মানুষ যেন তোমার সঙ্গে পীরিত করতে না আসে—এমন ব্যবহার করবে যেন সে তোমাকে ভয় করে চলে··· তুমি তাকে দিয়ে কী করাতে চাও তা নিজের থেকেই বুঝে নিতে পারে যেন···'

'কাউকে শায়েস্তা করতে যাবার ইচ্ছে আমার নেই।'

'মিথ্যে কথা! বাঁচতে হলে তা করতেই হবে।'

তারপর সে ব্যাখ্যা করে: একদল লোক শুধু কাজ করে যাবে, আর একদল লোক শায়েস্তা করবে; মাথার ওপরে যারা আছে তাদের কাজ হচ্ছে এটুকু দেখা যে প্রথম দল যেন দ্বিতীয় দলের কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে।

'যাদের দিয়ে কাজ হয় না তাদের লাথি মেরে দূর করে দাও! কোনো রকম ঝামেলার ছিটেফোঁটাও যেন কোথাও না থাকে!'

'কোথায় যাবে তারা?'

'তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কোনো দরকার নেই! চোর ছ্যাঁচড় আর বাউণ্ডুলেরা আছে বলে—কতকগুলো জঞ্জাল আছে বলে—আমাদের মাথার ওপরে কর্তারা আছে। নিমক খেয়ে যে বেইমানি করে না তাকে হুকুম করার দরকার হয় না—সে নিজেই নিজের কর্তা। কোন্ ময়দা আমার কাজে লাগে আর কোন্ ময়দা লাগে না তা জানবার কোনো দায় দেশের শাসনকর্তার নেই; কিন্তু আমি ভালো কাজ করছি না মন্দ কাজ করছি তা তিনি নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন।'

মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, তার গলার স্বরে খানিকটা আবেগের ছোঁয়াচ লেগেছে। এটা কি অন্য কিছুর জন্যে তার একটা আকাঙ্ক্ষা? এমন একটা কিছুর জন্যে সন্ধান যা সে নিজেই জানে না? প্রবল একটা আগ্রহ নিয়ে আমি তার কথা শুনি; অপেক্ষা করি কখন অন্য ধরনের ভাষা ও চিন্তা তার কথায় প্রকাশ পায়—তাকে জানবার জন্যে আমি উৎসুক।

ইঁদুর, পোড়া বাকল আর শুকনো ধুলোর গন্ধ আসছে উনুনের তলা থেকে। নোংরা দেওয়ালগুলো যেন স্যাঁৎসেঁতে গরম নিশ্বাস ফেলছে আমাদের গায়ের ওপরে, পায়ে-দলা ময়লা মেঝেটার জীর্ণ অবস্থা, জায়গায় জায়গায় চাঁদের আলো পড়ে মেঝের অন্ধকার ফাটলগুলো বেরিয়ে পড়েছে।

জানলার শার্সির ওপরে পোকার দঙ্গল ; মনে হয়, পোকাগুলো আকাশের গায়েই লেগে আছে আর আকাশটাকে নোংরা করে তুলেছে। জায়গাটা গুমোট, মানুষের গাদাগাদি ভিড় আর এতবেশি নোংরা যে হাজার পরিষ্কার করলেও সাফ হবে না।

এখানকার এই জীবন কি মানুষের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে না ?

মনিব ধীরভাবে কথার পিঠে কথা গেঁথে চলে। যেন এক অন্ধ ভিখিরি কাঁপা-কাঁপা হাতে ভিক্ষের ঝুলির মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে পয়সা খুঁজছে।

'বিজ্ঞানের কথা বলছ— আচ্ছা বেশ ! আমাকে এমন একটা উপায় বাতলে দিক তো যাতে ধুলো বা কাদা থেকে ময়দা তৈরি করে নিতে পারা যায় —দেখি কত ক্ষমতা! আর সেই প্রকাণ্ড বাড়িটা তো চোখের ওপরেই রয়েছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিত্যালয়। ছোকরা পড়ুয়াগুলোর কী চনমনে স্বভাব ! মত্ত অবস্থায় পানশালায় ঘোরাঘুরি করে, রাস্তায় রাস্তায় হুটোপাটি লাগায়, সেন্ট ভারলাম সম্পর্কে অশ্লীল গান গায় আর পেস্‌কি পাড়ার বেশ্যাগুলোর কাছে যাতায়াত করে। মোটামুটি গির্জার পাদরিদের মতোই দিব্যি খাওয়া-থাকার বন্দোবস্ত।···আর আচমকা একদিন তারা হয়ে বসে কেউ ডাক্তার, কেউ হাকিম, কেউ মাষ্টার, কেউ উকিল ! এদের কথায় আমি বিশ্বাস করতে যাব ? বললেই হল ? সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজে মানুষ হিসেবে যতোটুকু খাঁটি আছি, এই লোকগুলো হয়তো তাও নেই ! কাজেই কোনো মানুষকেই আমি বিশ্বাস করি না···'

তারপর সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেয়েদের সঙ্গে ছাত্রদের কাণ্ডকারখানার বর্ণনা দিয়ে চলে। ভারি বিশ্রী লাগে শুনতে। বলে আর লালসায় ঠোট চাটে।

স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে কথা বলবার সময়ে খৈ ফোটে তার মুখে। আর তার কথার মধ্যে থাকে একটা নিটোল বিদ্বেষ ও নিস্পৃহ ঔদাসীন্য, বেয়াড়াভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বিশেষ একটা বক্তব্যকেই তুলে ধরে সব সময়ে, কথা বলতে বলতে গলার স্বরটা আস্তে আস্তে চাপা ফিসফিসানির মতো হয়ে ওঠে। স্ত্রীলোকদের মুখের বর্ণনা তার মুখে কক্ষনো শুনতে পাওয়া যায় না ; সে

শুধু বর্ণনা দেয় তাদের বুকের, উরুর, পায়ের। ভারী বিশ্রী লাগে এইসব গালগল্প শুনতে।

'বিবেকের কথা, সিধে রাস্তায় চলবার কথা—এসব তো তোমার মুখে সব সময়েই শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু শুনে রাখ, সিধে রাস্তায় চলবার কথাই যদি ওঠে তবে সে-গুণটা তোমার চেয়ে আমার মধ্যেই বেশি আছে। তুমি অবিশ্যি মুখের ওপরে বেশ কড়া কড়া দু-কথা শুনিয়ে দিতে পার, কিন্তু সিধে রাস্তায় তুমি চলো না—কোনো হিসেবেই না! দু-একটা ব্যাপার আমিও জানি! সেদিন তুমি পানশালায় গিয়ে খবরের কাগজের লোকদের কাছে বলে এসেছ যে আমার কারখানায় তৈরি রুটি-বিস্কুট সব নাকি পচা মাল, এখানে নাকি মেঝের ওপরে ময়দা মাখা হয়, জায়গাটা আরশোলায় ভর্তি, যারা কাজ করে তাদের সিফিলিস রোগ আছে, এখানে চারদিকে শুধু নোংরা আর নোংরা…'

'এসব কথা তো আপনাকেও বলেছি আমি…'

'তা বটে! বলেছ ঠিকই! কিন্তু কথাগুলো তুমি যে আবার খবরের কাগজের লোকদের কাছেও বলে আসতে চাও, তা চেপে গিয়েছিলে। যাই হোক, খবরের কাগজের লোকেরা এসব কথা তাদের কাগজেও লিখেছিল। তারপর আর কি, যথারীতি পুলিস আসে, স্বাস্থ্য-বিভাগের লোকও আসে। সেই দলবলকে শান্ত করবার জন্যে একটা পঁচিশ-মার্কা নোট খসাতে হয়েছিল আমাকে। বাস, আর বিশেষ বেগ পেতে হয়নি—' এই বলে সে মাথার ওপরে হাতটাকে চক্রাকারে ঘুরিয়ে নেয় —'বুঝলে তো ব্যাপারটা? যা ছিল তাই রয়ে গেল। আরসোলারা এখনো তেমনি ফর ফর করে উড়ে বেড়াচ্ছে। এবার বুঝতে পারলে তো তোমার ওই খবরের কাগজ আর বিজ্ঞান আর বিবেকের দৌড় কতটুকু? বুঝলে হে হাঁদারাম, তুমি যা খুশি করতে পার, কিন্তু কিছুই ফল হবে না—তোমার চোখের সামনেই সমস্ত উলটে যাবে! এই এলাকায় যতো পুলিশ আছে সবাইকে আমার পায়ে পায়ে চলতে হয়, যতো মোড়ল আছে সবাইকে খরচ চালাবার জন্যে হাত পাততে হয় আমার কাছে। তোমার শুধু

তড়পানিটুকুই সার হবে! আর তারপরেও তুমি কিনা আমার বিরুদ্ধে যেতে চাইছ—আরসোলা হয়ে কুকুরের সঙ্গে লড়তে আসা! দূর, দূর, তোমার সঙ্গে কথা বলতেও আমার ঘেন্না হয়…'

আর সত্যি সত্যিই সেই মুহূর্তে তাকে দেখে অসুস্থ মনে হতে থাকে। তার মুখটা ঝুলে পড়েছে, ক্লান্তিতে দুই চোখ বোজা, অস্পষ্ট গোঙানির মতো শব্দ তুলে হাই তুলছে, হাঁ-হয়ে-থাকা লাল চিবুকটার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে কুকুরের মতো লিকলিকে একটা জিভ।

এই লোকটির সঙ্গে দেখা হবার আগেও অনেক মানুষের সংস্পর্শে আমি এসেছি। মানুষের স্থূলতা নিষ্ঠুরতা ও নির্বুদ্ধিতার দৃষ্টান্ত যেমন ভুরি ভুরি দেখেছি, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে মহানুভবতা ও সত্যিকারের মানবতার দৃষ্টান্তও কম দেখিনি। কয়েকটি আশ্চর্য সুন্দর বই পড়েছি; আমি জানি মানুষ সর্বত্রই দীর্ঘকাল ধরে অন্য এক ধরনের জীবনের স্বপ্ন দেখে আসছে এবং কোনো কোনো জায়গায় এই স্বপ্নকে বাস্তব করে তোলবার জন্যে অদম্য প্রাণশক্তি নিয়ে চেষ্টা করছে। বর্তমানে যে অবস্থা চলেছে তার বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষ অনেকদিন ধরে আমার মনের মধ্যে জমা হয়ে হয়ে দুধে-দাঁত হয়ে ফুটে উঠেছে আর আমার বিশ্বাস ছিল যে এই দাঁতগুলো যথেষ্ট শক্ত।

এতদিনে, যতোবার এমনি ধরনের কথাবার্তা হয় ততোবারই, ক্রমেই বেশি বেশি স্পষ্টভাবে এবং দুঃখের সঙ্গে আমি বুঝতে পারি যে আমার চিন্তা ও স্বপ্ন কত ভঙ্গুর, কত অসংলগ্ন! আর কী নিপুণভাবে আমার মনিব আমার চিন্তা ও স্বপ্নকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে! তার ফলে, আমার চিন্তা ও স্বপ্নের মধ্যে যে কতগুলি অন্ধকার ফাঁক ছিল তা বেরিয়ে পড়েছে আর বিষণ্ণ একটা সংশয়ে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে আমার সমস্ত মন। যা কিছুতে আমি বিশ্বাস করি সমস্তই আমার মনিব পরম নির্লিপ্ততার সঙ্গে অস্বীকার করে। আমি জানি, আমার এই ধারণা ঠিকই আছে যে আমার মনিব ভুল করছে এবং মুহূর্তের জন্যেও আমার মতামতের সত্যতা সম্পর্কে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবুও, সে যেভাবে নোংরা ছুঁড়ে চলে তার থেকে

আড়াল তুলে আমার বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখতে পারছি কৈ ! এখন আর প্রশ্নটা এই নয় যে আমার মনিবের মতামতকে অগ্রাহ্য করতে হবে, প্রশ্নটা হচ্ছে আমার নিজের অন্তরের বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখা। আমার মনিবের মানব-বিদ্বেষের সামনে আমি নিজে যে কত অক্ষম তা বুঝতে পেরে আমি মুষড়ে পড়েছি এবং আঘাতটা গিয়ে লাগছে আমার অন্তরের বিশ্বাসের উপরে।

আমার মনিবের মনটা হচ্ছে একটা কুড়ুলের মতো, তেমনি ভারী, তেমনি অমার্জিত ; গোটা জীবনকে সে এই কুড়ুল দিয়ে ফালা ফালা করেছে এবং সমান সমান টুকরোয় ভাগ করে ছোট ছোট জমাট স্তূপে জড়ো করেছে আমার চোখের সামনে।

ভগবান ও আত্মা সম্পর্কে সে যা কিছু বলে তার ফলে আমার তরুণোচিত কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়েছে। আমি সব সময়ে চেষ্টা করি, কথাবার্তাকে এইসব প্রসঙ্গে নিয়ে যেতে। আমার মতলবকে আমার মনিব ধরতে পারে না বলেই মনে হয় ; সে শুধু প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে জীবনের গোপন রহস্য ও কৌশল সম্পর্কে কত অল্প আমার জ্ঞান !

'বেঁচে থাকাটা অত সহজ নয়—সেজন্যে খুব সাবধান হয়ে চলা দরকার ! জীবন মানুষকে সর্বস্বান্ত করে ফেলতে চায় ; মানুষের জীবন হচ্ছে অনেকটা যেন ঘরের মেয়েলোকের মতো। তার দাবির শেষ নেই। কিন্তু ঘরের মেয়েলোকের কাছে তোমার নিজের দাবি কি খুব বেশি ? মোটেই নয়। ঘরের মেয়েলোকের কাছে চাওয়ার একটি মাত্র জিনিসই আছে—খানিকটা স্ফূর্তি ! আর এই স্ফূর্তিটুকু পাবার জন্যেই রীতিমতো কলাকৌশল দরকার—যেখানে সম্ভব হবে, মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে স্ফূর্তিকে পেতে হবে ; যেখানে মিষ্টি কথায় কাজ হবে না সেখানে কেড়ে নিতে হবে ; অর্থাৎ কোনো রকম বাচবিচার না করে সিধে হাজির হতে হবে—বাগে না আসে তো দমাদ্দম কষিয়ে দাও দু-এক ঘা—বাস্, দেখবে, যা চাও তা তুমি পেয়ে গেছ !'

এইসব কথাবার্তা শুনে আমার মনে জ্বালা ধরে যায়, তারপর যদি কখনো সরাসরি প্রশ্ন করি তো সে বলে :

'তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন! ভগবানে আমি বিশ্বাস করি বা না করি—সেজন্যে জবাবদিহি করতে হবে আমাকে, তোমাকে নয়...'

তারপর যখন আমি আমার প্রিয় বিষয়গুলি সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করি, সে বসে বসে অনবরত মাথা নাড়ে—যেন মাথাটাকে নিয়ে সে কিছুতেই স্বস্তি বোধ করছে না। আমার কথা শোনবার জন্যে ক্ষুদে কানটা বাড়িয়ে দেয় আমার মুখের দিকে এবং একটিও কথা না বলে ধৈর্যের সঙ্গে আমার কথা শোনে। আর এই সময়ে তার খাঁদা নাকওলা থ্যাবড়া মুখটার ওপরে অবধারিত ভাবে ফুটে ওঠে পরম নির্লিপ্ত ভাব—দেখে মনে হয় যেন একটা তামার ডালা আর ডালার ঠিক মাঝখানটিতে রয়েছে একটি মুণ্ডি।

তীব্র একটা জ্বালাবোধ অলক্ষ্যে আমার মন জুড়ে বসে। অবশ্য এই জ্বালাবোধটা আমার নিজের কথা ভেবে নয়; মনের মধ্যে বিক্ষোভ পুষে রাখতে রাখতে আমি ক্লান্ত হয়ে উঠেছি, ঘা খেয়ে খেয়ে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে আজকাল আর গায়ে লাগে না, ঘা খেয়েও দিব্যি নির্বিকার থাকতে পারি এবং অনায়াসে তাচ্ছিল্য করতে পারি। আমার জ্বালাবোধ আমার অন্তরের সত্য ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে বলে—এই সত্যকে আমি অন্তরের মধ্যে জীইয়ে রেখেছি এবং বড়ো করে তুলেছি।

মানুষের ভালবাসার ধন ও বেঁচে-থাকার প্রেরণাকে মানুষ যদি উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে জীইয়ে রাখতে না পারে—তবে তা হয়ে ওঠে যন্ত্রণাকর হীনম্মন্যতা ও সুতীক্ষ্ণ জ্বালা; মানুষকে যদি বুকে পাথর বেঁধে বোবা হয়ে থাকতে হয় তবে তার চেয়ে তীব্র বেদনা আর কিছু নেই।

মনিব রোজ রাত্রে আমার সঙ্গে গল্পগুজব করতে আসে—এই ঘটনার ফলে কারখানার লোকদের কাছে আমি একটা কেউকেটা লোক হয়ে উঠেছি। এতদিন অনেকে মনে করত, আমি একটা গোলমেলে ও বিপজ্জনক প্রকৃতির লোক; অনেকে মনে করত, আমি বাতিকগ্রস্ত, আমার স্বভাবটা বেয়াড়া; কিন্তু এইসব ধারণা এখন আর নেই। তবে স্পষ্টই বোঝা যায়,

অধিকাংশ লোকের চোখেই আমি হচ্ছি ধূর্ত প্রকৃতির লোক, গূঢ় একটা মতলব নিয়ে এতদিন গভীর জলে খেলা করে বেড়িয়েছি। আমার সৌভাগ্য দেখে তারা যে হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরছে—এই ব্যাপারটা তারা চেষ্টা করেও গোপন করতে পারে না।

ধুলোমাখা পাকা দাড়ির গোছায় হাত বুলোতে বুলোতে এবং চঞ্চল চোখ-দুটো দূরের দিকে নিবদ্ধ করে কুজিন সমীহভরা সুরে আমাকে বলে :

'আরে ভাই, এবার তো তুমি দেখতে দেখতে বাবু হয়ে বসবে, কেউ তোমাকে ঠেকাতে পারবে না…'

কে যেন নির্বিকারভাবে মন্তব্য জুড়ে দেয় :

'হ্যাঁ, আমাদের দাব্‌ড়ানি দেবার জন্যে—'

আমার আড়ালে আরো সব রূঢ় কথাবার্তা চলে :

'দেখা যাচ্ছে, মাথা খাটিয়ে কথা বলতে পারলে শুধু যে কিয়েভ যাবার হদিশ পাওয়া যায় তা নয়…'

'লোকটাকে হাতে রাখা যাক হে…'

আর অনেকেই এখন আমার অনুগ্রহপ্রার্থী। আমার কথা সবার শিরোধার্য। ভারি বিশ্রী লাগে আমার।

আর্তেম, পাশ্‌কা ও আরো দু-একজন ছিল যাদের কথাবার্তায় আমার প্রতি একটা অন্তরঙ্গতার ভাব প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। তারাও আর আগেকার মতো নেই। আমার কথাবার্তায় তারা ভয়ানক রকমের বেশি মনোযোগ দিতে শুরু করেছে, আমার সঙ্গে তাদের সম্পর্কের মধ্যে এই অতি-মনোযোগটুকু তলে তলে প্রকাশ পেতে থাকে। একদিন তো আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলে বেশ রাগের সঙ্গেই জিপ্‌সিকে জানিয়ে দিই যে আমার সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার করার কোনো অর্থই হয় না; এতে আমার খুবই খারাপ লাগে!

আমার বক্তব্যের অর্থ ও ঠিক ধরতে পেরেছে। চোখের নীলচে সাদা অংশের ঝলক তুলে কুটিল স্বরে জবাব দেয়, 'আমি তোমাকে বলছি শোন—যেমনটি চলছে চলতে দাও। এখানে আমরা যতোগুলি লোক আছি তার

মধ্যে সবচেয়ে চালাক-চতুর লোক হচ্ছে আমাদের মনিব। আর সে-ই কিনা তোমার সঙ্গে সব বিষয়ে আলোচনা করতে আসে! তাহলে বুঝতে হবে যে ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি বলবার মতো বুদ্ধি তোমার মগজে আছে!…'

শাতুনভের কথা আলাদা। এই লোকটি এমনিতে মনমরা হয়ে থাকে, কথাবার্তা বিশেষ বলে না; কিন্তু আমার সঙ্গে ওর আরো বেশি ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, আরো বেশি-বেশি বিশ্বাসের সঙ্গে ও আমার কাছাকাছি এগিয়ে আসছে। ওর চোখদুটো বিষাদমাখা ও ভাবলেশহীন, কিন্তু আমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হলেই ওর চোখদুটো আবেগে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, পুরু ঠোঁটদুটো আস্তে আস্তে ছড়িয়ে গিয়ে ফুটে ওঠে এক প্রাণখোলা হাসি, পোড়-খাওয়া পাথুরে মুখখানা বদলে যায় একেবারে।

'কেমন, আগেকার চেয়ে ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেছে না?'

'সহজ নয়, পরিষ্কার…'

'একই কথা! পরিষ্কার হওয়া মানেই সহজ হওয়া!' মুরুব্বির মতো সুরে সে বলে। তারপর দূরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে—যেন হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেছে এমনিভাবে—জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা. 'বখ্‌তির্‌মান-পুরাণ' মানে কি?'

'জানি না।'

বেশ বোঝা যায়, আমার কথা ও বিশ্বাস করেনি। মুখ ফিরিয়ে বাঁকা পা-দুটোকে টানতে টানতে ও অন্য দিকে চলে যায়; মুখের দুর্বোধ্য একটু শব্দে ওর বিব্রত ভাবটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ কাটে না, আবার হয়তো এসে জিজ্ঞেস করে:

'তাহলে 'সভর্‌সান-সামো' কথাটার মানে কি বলতে পার?'

এই ধরনের প্রচুর শব্দ ওর ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে। মোটা মোটা ভাঙা গলায় যখন সে শব্দগুলিকে উচ্চারণ করে তখন শব্দগুলোকে ভারি অদ্ভুত শোনায়, বলার ভঙ্গির মধ্যে পুরনো গাথা বা কাহিনীর আমেজ এসে যায় যেন।

'এসব কথা তুমি কোথায় পেয়েছ?' অবাক ও কৌতুহলী হয়ে আমি

জিজ্ঞেস করি। সে সরাসরি জবাব দেয় না, সতর্ক হয়ে পাল্‌টা প্রশ্ন করে :

'একথা কেন তুমি জানতে চাইছ ?'

কিন্তু তাই বলেও থামে না। আবার এক সময়ে আচমকা প্রশ্ন করে বসে : 'বলতে পার' 'হুর্ণো' কথাটার মানে কি ?' মনে হয়, আমার অন্য-মনস্কতার সুযোগ নিয়ে আমাকে ও হকচকিয়ে দিতে চাইছে।

কোনো কোনো দিন কাজের শেষে বা ছুটির আগের দিন সন্ধ্যার সময় স্নান-টান সেরে জিপ্‌সি ও আর্তেম এসে হাজির হয় আমার কাছে। ওদের পিছু পিছু আসে অসিপ শাতুনভ। ঠেলেঠুলে নিজের জন্যে খানিকটা জায়গা করে নেয়। অন্ধকার কোণে চুল্লির চারপাশে আমরা গোল হয়ে বসি। জায়গাটাকে আমি ঝাঁট দিয়ে ধুয়েমুছে তকতকে করে রেখেছি, ফলে জায়গাটা স্বাচ্ছন্দ্যকর হয়ে উঠেছে। আমাদের ডানদিকের দেওয়ালে এবং আমাদের পিছন দিকে রয়েছে সারি সারি তাক ; তাকের ওপরে অনেকগুলি গামলা, আর গামলাগুলির মধ্যে থেকে ময়দার লেই চুড়ো হয়ে উঠে আছে। দেখে মনে হয়, অনেকগুলি টাক-মাথা দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়ে থেকে আমাদের দিকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। মস্ত একটা টিনের কেটলিতে মণ্ডা-পাকানো চায়ের পাতা ঘন করে ভেজানো হয় আর সেই চা আমরা খাই। পাশ্‌কা প্রস্তাব করে :

'আচ্ছা, এবার যা-হোক কিছু বলো শুনি—বরং না হয় একটা কবিতাই পড়ে শোনাও !'

চুল্লির ওপরে একটা তাকে আমার বাক্‌সের মধ্যে আছে তিনটি কবিতার বই—পুশ্‌কিনের, শ্‌চেরবিনার ও সুরিকভ-এর। পুরনো বইয়ের দোকান থেকে বইগুলো কেনা, চেহারার কোন জৌলুস নেই। আবেগদীপ্ত সুরেলা গলায় আমি পড়ি :

হে মানুষ !
কী বিপুল তব গরিমা কী মহান কী উজ্জ্বল !
(যেন) ঈশ্বরের আপন প্রভা নেমে আসে স্বর্গ হতে
মাটির পৃথিবীতে।

তোমার আত্মায় বিধৃত এ জগৎ
কী এক নিবিড় মধুর ঐকতান—
সবাকার ডাকে দেয় সাড়া
অন্তরের ছবি যায় পড়া।

বোকার মতো চোখ পিটপিট করতে করতে এবং আড়চোখে বইয়ের পৃষ্ঠার দিকে উঁকি দিয়ে দেখে অবাক-হওয়া সুরে পাশ্‌কা বিড়বিড় করে বলে :

'ভারি অদ্ভুত তো! বাইবেলের মতো! এসব গান তো গির্জায় গিয়েও গাওয়া চলে দেখছি। দোষ নিও না ভগবান!…'

কবিতা শুনলে পাশ্‌কা আর স্থির থাকতে পারে না। এমনি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। এর ব্যতিক্রম প্রায় হয়ই না বলতে গেলে। আর তখন ওর মনটা অনুতাপের সুরে বাঁধা হয়ে যায়। কোনো কোনো কবিতা শুনে খুবই বিচলিত হয় ও, তখন সেইসব কবিতা আবার আপন মনে আবৃত্তি করে, আবৃত্তি করতে করতে হাত দোলায়, মাথার কোঁকডা কোঁকড়া চুল টানে আর হিংস্রভাবে অভিশাপ দেয়।

'এই তো চাই!'

দারিদ্র-পীড়িত আমার এ জীবন
বিধিলিপি মোর—দুর্লঙ্ঘ্য ও অমোঘ
ভুলে যেতে হবে সকল আশার বাণী—

'বা, এই তো চাই! কি কাণ্ড দেখেছ তো—মাঝে মাঝে নিজের কথা ভেবেই নিজেরই এমন দুঃখ হয়! মনে হয় আর নিস্তার নেই—উচ্ছন্নে যেতে হবে সবাইকে! বুকের ভেতরটা ভয়ানক একটা ব্যাথায় টনটন করে ওঠে! ভারি বিশ্রী ব্যাপার! মানুষ কী করতে পারে? ডাকাতি করতে বার হবে? ধুলোর দানা ছুঁড়ে চড়ুইপাখিকে কখনো মারা যায় না। তবুও অনবরত আমাদের শুনতে হয়—আমরা যেন ঝগড়া-বিবাদ না করি, আমরা যেন মিলে-মিশে থাকি! হায় হায়!'

আর্তেম কবিতা শুনতে শুনতে ঢোঁক গেলে আর ঠোঁট চাটে। দেখে মনে হয়, সে যেন গরম ও সুস্বাদু কোনো জিনিস গিলে গিলে খাচ্ছে।

আর কবিতায় যদি প্রাকৃতিক বর্ণনা থাকে তাহলে তো আর কথাই নেই। যখনই শোনে, সে অবাক হয়।

সোনালী স্তবকে মোড়া অপরূপ সাজে
প্রতীক্ষা আনত বৃক্ষ পুষ্করিণী তীরে

'থাম, থাম!' চাপা স্বরে সে বলে ওঠে; গলার স্বরে বিস্ময়, উত্তেজনা আর আবেগ। আমার কাঁধ আঁকড়ে ধরেছে; উদ্ভাসিত মুখ। বলে, 'এই দৃশ্য আমি দেখেছি! আমি দেখেছি! আস্ক-এর কাছে একটা গোলা-বাড়িতে—কী কাণ্ড, এঁ্যা!'

রেগে গিয়ে পাশ্‌কা বলে. 'দেখেছ তো হয়েছে কি শুনি?'

'বলো কি? বুঝতে পারছ না—আমি নিজের চোখে দেখেছি! আর সেই কথাই কিনা লেখা রয়েছে···

'গোল কোরো না তো! যতো সব আপদ!

একবার হয় কি, সুরিকভের কবিতা 'গ্রামদেশে' শুনে আর্তেম একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তিনদিন তার আর কোনো খেয়াল থাকে না; শ্রোতারা যতোই বিরক্ত ও উত্যক্ত হোক না কেন, 'পোল্‌তাভার রণাঙ্গনে' নামে পুরনো ফৌজী গানের সুরে সে এই একই কবিতা গুণ গুণ করে গাইতে থাকে।

পায়ে পায়ে আমি ঘুরে বেড়াই
নেই কোন লক্ষ্য নেই নিশানা
কী বা আসে যায় থাকি কোথায়
ডাঙ্গায় অথবা কোনো নদীতে
পথ শেষ হলে আছে তো ঘর···

কবিতা শুনে শাতুনভ বিচলিত হয় না। সম্পূর্ণ নির্বিকার ভাবে ও কবিতা শুনে যায়। তবে মাঝে মাঝে হঠাৎ কোনো একটা বিশেষ শব্দকে এমনভাবে ধরে বসে এবং শব্দটির অর্থ পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্যে এমনভাবে পীড়াপীড়ি করতে থাকে যে কিছুতেই ওর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

'একটু সবুর করো একটু সবুর করো—কথাটা কী বললে শুনি—ভস্মাধার?'

শব্দ সম্পর্কে অদ্ভুত আগ্রহ ওর। আমি নিজেও ব্যাপারটা বুঝতে পারি না। ওর মতলবটা কী, জানবার জন্যে ভারি কৌতূহল হয় আমার।

একদিন নানাভাবে জেরা ও অনুরোধ-উপরোধ করার পর অসিপ আসল ব্যাপারটা ভাঙে। মুরুব্বির মতো একটু হেসে বলে :

'তাহলে তোমরাও এসে জুটলে—এ্যাঁ ?'

মুখের ওপরে গম্ভীর একটা রহস্যের ভাব ফুটিয়ে তুলে চারদিকটা দেখে নেয় একবার, তারপর ফিসফিস করে বলতে থাকে :

'একটা গোপন মন্ত্র আছে—মন্ত্রটা জানা থাকলে যে-কোনো কাজ করা যায়—এমন ক্ষমতা সেই মন্ত্রের! কিন্তু আজ পর্যন্ত কারও পক্ষে সেই মন্ত্র পুরোপুরি জানা সম্ভব হয়নি—মন্ত্রের আলাদা আলাদা শব্দগুলো আলাদা আলাদা লোক জানে; এইভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে সেই মন্ত্র। সময় না হলে পুরো মন্ত্রটি জানা যাবে না। তাহলেই দেখছ, এই শব্দগুলোকে একটা একটা করে যোগাড় করতে হবে, তারপর একটির সঙ্গে অপরটিকে জোড়া লাগিয়ে তৈরি করতে হবে পুরো মন্ত্রটিকে—'

ওর গলার স্বর আরো নেমে গেছে, কথা বলতে বলতে ঝুঁকে পড়েছে আমার দিকে।

'আর সেই মন্ত্রটিকে যেদিক থেকে খুশি পড়া চলে। গোড়া থেকে পড়লেও যা, শেষ থেকে পড়লেও তা। মন্ত্রের কয়েকটা শব্দ আমার যোগাড় করা হয়ে গেছে। একজন ভবঘুরে লোক হাসপাতালে মরবার সময় শব্দগুলো বলে গেছে আমাকে। আসলে ব্যাপারটা কি জান, যাদের ঘরবাড়ি নেই সেইসব মানুষ এই গোপন শব্দগুলোর সন্ধানে সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়! যেখান থেকে পারে, শব্দগুলোকে তারা একটা-একটা করে যোগাড় করে! এইভাবে সমস্ত শব্দ জানা হয়ে গেলে পর সবাই এই মন্ত্রের কথা শুনবে—'

'তাই নাকি ?'

দু'চোখে অবিশ্বাস নিয়ে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাকিয়ে দেখে সে। তারপর ক্রুদ্ধস্বরে বলে :

'ঠিক তাই! তুমি নিজেই তো এই মন্ত্রটা জানো—'

'তোমার পা ছুঁয়ে বলছি—আমি কিছু জানি না!'

'বটে,' বলে সে একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠে মুখ ফিরিয়ে নেয়, 'থাক, আর লুকোতে হবে না...'

হঠাৎ একদিন সকালে আর্তেম আসে ছুটতে ছুটতে। সারা মুখে উত্তেজনা, খুশিতে ঝলমল। কথা বলতে গিয়ে গলাটা কাঁপছে। বলে, 'বকবক-মহারাজ, আমি নিজেই একটা গান তৈরি করেছি, সত্যিকারের গান—আমি নিজেই!'

'সত্যি?'

'আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি—এটা যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি! আমি নিশ্চয়ই একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম আর স্বপ্নের মধ্যে কবিতাটা আমার মাথায় এসে গেছে। তাই তো জেগে উঠেই টের পেলাম, কবিতাটা তৈরি, মাথার মধ্যে কবিতাটা ঘুরছে—ঠিক যেন ধম্মের চাকার মতো! শুনবে তুমি...'

খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে শরীরটাকে টান করে দিয়ে চাপা সুরেলা গলায় সে আবৃত্তি করে চলে:

নদীর ওপারে ওই সূর্য অস্তাচলে
এখনি ডুবিবে সূর্য অরণ্যের তলে
সেথায় রাখাল ছেলে গোচারণ মাঠ
আছে... এক গ্রাম...

'তারপর?'

অসহায় দৃষ্টিতে সিলিং-এর দিকে তাকায় সে। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, ঠোঁট কামড়াচ্ছে, নির্বাক হতাশায় পিটপিট করছে চোখ, তারপর তার সরু কাঁধদুটো ঝুলে পড়ে, বিব্রত ভঙ্গিতে হাত নাড়ে।

'ভুলে গেছি—একেবারে ভুলে গেছি! কিচ্ছু মনে নেই...'

বলতে বলতে বেচারী কেঁদে ফেলেছে। দর দর করে জল গড়াতে থাকে তার বড়ো বড়ো চোখ থেকে। রোগাটে ও ক্লিষ্ট মুখখানা কুঁকড়িয়ে ছোট হয়ে গেছে, বুকের ওপরে ঠিক হৃদপিণ্ডের কাছে অসহায় ভাবে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে হাতটা! অপরাধীর মতো সুরে সে বলে:

'ভাবতে পারো একবার—হায়, হায় গো—কি চমৎকারই না হয়েছিল কবিতাটা···একেবারে বুকের মধ্যে গিয়ে নাড়া দিত—ইস্, কী যে হয়ে গেল··· ভাবছ, আমি ছেলেমানুষি করছি—না ?'

মুখ ফিরিয়ে কোণের দিকে চলে যায়। মাথাটা ঝুলে পড়েছে। কোণায় গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কাঁধ ঝাঁকুনি দিচ্ছে, পিঠটা বেঁকে গেছে। তারপর নিঃশব্দে ফিরে যায় নিজের কাজে। সারাদিনটা কাটে অন্যমনস্ক ও বিমর্ষভাবে। সন্ধ্যার সময়ে প্রচুর মদ খেয়ে বিশ্রীরকমের মাতাল হয় আর একটা হুটোপাটি লাগিয়ে দেবার জন্তে চিৎকার শুরু করে:

'ইয়াশ্কা কোথায় ? এ্যা ? কোথায় ইয়াশ্কা ? কী হয়েছে আমার ছোট ভাইটার ? চুলোয় যাও তোমরা—'

অন্য সবার ইচ্ছে ছিল, তাকে ধরে আচ্ছা করে মার দেয়। কিন্তু জিপ্সি তার পক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়েছে। মাতাল আর্তেমকে ধরেবেঁধে থলের ওপরে শুইয়ে আমরা ঘুম পাড়িয়ে দিই।

স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যে গানটা সে পেয়েছিল, তা আর সে কোনোদিন মনে করতে পারেনি···

মনিবের কামরা আর কারখানা-ঘরের মাঝখানে শুধু একটা কাগজ আঁটা পাতলা দেওয়াল। কখনো যদি আমি খেয়ালশূন্য হয়ে জোরে চেঁচিয়ে উঠি, তাহলে মনিব দেওয়ালের ওপরে দুম করে একটা ঘুষি মারে। সেই ঘুষির শব্দে আমরা চমকে উঠি, আরশোলাগুলোও চমকে ওঠে। আমার সঙ্গীরা চুপচাপ ঘুমোতে চলে যায়, আরশোলাগুলো ফর ফর করে জীর্ণ দেওয়াল-কাগজের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকে, আর আমি একা বসে থাকি।

মাঝে মাঝে এমন হয়, মস্ত একটা কালো মেঘের মতো নিঃশব্দসঞ্চারে মনিব ঘর থেকে বেরিয়ে আসে; আচমকা এসে বসে পড়ে আমাদের মাঝখানে। ঝাঁঝালো গলায় বলে:

'মাঝরাত্তির পর্যন্ত সব জেগে বসে আছ—চুলোয় যাও সব! রাত্তিরবেলা জেগে থাকবে, আর সকালবেলা উঠবার নামটি করবে না—কত বেলা অব্‌দি নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে কে জানে!'

এই কথাগুলো পাশকা ও অন্য সবাইকে লক্ষ্য করে বলা। তারপর আমাকে লক্ষ্য করে তর্জনগর্জন শুরু হয়:

'ওহে কবিতা পড়ুনী, আবার তুমি এসব রাত্তিরবেলার কাণ্ড-কারখানা শুরু করেছ! সবুর করো না, তোমার এই পড়া শুনে শুনে ওদের একবার বুদ্ধি খুলে যাক—তারপর টের পাবে মজাটা! তখন আর কারও হাড আস্ত থাকবে না—আর তোমাকেই প্রথমে এসে ধরবে—'

কথাগুলো বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য করে বলা নয়। বলতে হয় তাই বলা, আসরটা ভেঙে দেবার ইচ্ছা এর পিছনে নেই। বলতে বলতে আমাদের পাশেই মেঝের ওপরে থপ্‌ করে বসে পড়ে এবং খানিকটা প্রশ্রয় দেবার মতো সুরেই বলে:

'পড়ে যাও তো হে! একটু না হয় শোনাই যাক! চাই কি, আমারও হয়তো খানিকটা বিদ্যে হয়ে যেতে পারে!…ওহে পাশ্‌কা একটু চা দাও তো দেখি!'

জিপ্‌সি একটু রহস্য করবার চেষ্টা করে:

'ভাসিলি সেমিয়োনিচ, আমরা আপনাকে চা খাওয়াচ্ছি, আপনি আমাদের ভদ্‌কা খাওয়ান!'

মনিব মুখে কোনো জবাব দেয় না, মোলায়েম ভঙ্গিতে দু আঙুলের মধ্যে বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে।

কখনো বা মনিব আমাদের সঙ্গেই যোগ দেয়; এসেই খেদভরা অদ্ভুত এক স্বরে বলতে শুরু করে:

'ঘুম আসছে না হে—ইঁদুরগুলো ভারি জ্বালাতন করছে! মরেও না ওগুলো! আর এই কলেজের ছোকরাগুলো জাহান্নামে যায় না কেন! মড় মড় করে বরফের ওপর শব্দ তুলে ঘোরাঘুরি করছে দেখ! আর এই মাগীগুলোর দোকানে যাতায়াতের আর যেন শেষ নেই—শরীর গরম করতে

আসে সব! দোকানের ভিতরটা তো গরম—তাই তিন কোপেক দিয়ে একটা রুটি কিনতে এসে আধঘণ্টা ধরে ফষ্টিনষ্টি করে···'

এইবার মনিবের তত্ত্বকথা শুরু হবে! শুনতেই হবে আমাদের। আমরা তৈরি হয়ে থাকি।

'সবাই সমান—দেবার বেলায় ঢু-ঢু, নেবার বেলায় হাত বাড়িয়েই আছে! তোমরাও এই দলে—সব সময়ে ফিকিরে ফিকিরে থাক যে আরেকটু কম খাটুনির চাকরি পাওয়া যায় কিনা! শুধু এইটুকুই জান তোমরা—সুযোগ পেলেই কেটে পড়বে আর বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াবে···'

পাশ্‌কা হচ্ছে এই কারখানার মাথা। কথাটা শুনে তার আঁতে ঘা লাগে। তর্ক তুলে লাভ নেই, তবুও তর্ক তোলে সে ঃ

'ভাসিলি সেমিয়োনিচ, এত পেয়েও আপনি খুশি নন! এমনিতেই আমরা এখানে গাধার মতো খাটছি! অপরাধ না নেন তো একটা কথা বলি, আপনি নিজে যখন এখানে কাজ করতেন···'

এভাবে পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দেওয়া মনিবের পছন্দ নয়। নিজে একটিও কথা না বলে সে পোড়ানীর কথাগুলো খানিকক্ষণ শোনে; তার ঠোঁটদুটো কুঁচকে গেছে, সবুজ চোখটা ভৎসনায় কুটিল—তারপরে এক সময়ে সে তার ব্যাঙের মতো মুখটা হাঁ করে ক্যান্‌কেনে গলায় বলতে থাকে ঃ

'পুরনো দিনের কথা পুরনো হয়ে গেছে; এখনকার কথা এখন! এখন আমি হচ্ছি এখানকার মনিব—আমি যা খুশি বলতে পারি! আমার কথা শুনতেই হবে তোমাদের—এই হচ্ছে নিয়ম! বুঝলে তো? কই হে বকবক-মহারাজ, পড়ো তো শুনি!'

একদিন আমি পড়লাম 'ডাকাত ভাইদল'। শুনে সবাই খুব খুশি। এমন কি মালিকও চিন্তাগ্রস্ত ভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল ঃ

'হ্যাঁ, এমনটি হওয়া সম্ভব···কেন হবে না? নিশ্চয়ই সম্ভব। মানুষের জীবনে যে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে···হ্যাঁ, যে কোনো ঘটনা!'

জিপসি ভুরু কুঁচকিয়ে তাকিয়ে আছে। তারপর আঙুলের ফাঁকে একটা

সিগারেট পাকিয়ে নিয়ে ভীষণভাবে টানতে শুরু করে। আর আর্তেমের মুখে আবছা একটু হাসি। সে কবিতাটা মনে করবার চেষ্টা করছে :

ছিলাম আমরা দুজন—আমার ভাই আর আমি···
আর শোন তোমাদের বলি
আমাদের জীবনে ছিল না কোনো আনন্দ—

ওদিকে শাতুনভ চুল্লির গর্তের দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে। তেমনি ভাবে তাকিয়ে থেকেই ফস করে বলে বসল :

'আমি এর চেয়েও ভালো একটা কবিতা জানি···'

'তবে কবিতাটা শোনাই যাক।' প্রস্তাব করে মনিব। মস্ত লম্বা দুটি হাত, ধুমসো শরীর, সারা শরীরের মধ্যে একটা বিদ্রূপের ভাব ফুটে উঠেছে। আর কথাটা শুনে অসিপ এতবেশি ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায় যে এমন কি তার ঘাড় পর্যন্ত রক্তের উচ্ছ্বাসে টকটকে লাল হয়ে ওঠে, কানদুটো নড়তে থাকে।

'কবিতাটা বোধ হয় আমি ভুলে গেছি···'

'ঢঙ রাখো তো!' জিপসি প্রায় একটা ধমক দিয়ে ওঠে, 'কেউ তোমাকে মাথার দিব্যি দিতে যায়নি! বলেই ফেল দেখি কবিতাটা!'

আর্তেম অসিপকে উস্‌কে তোলবার চেষ্টা করে :

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেই ফেল বরং! মনটাকে খোলসা করে ফেল হে···'

অসহায় ভাবে এবং যেন কোনো একটা দোষ করে ফেলেছে এমনি ভাবে প্রথমে আমার দিকে এবং পরে মনিবের দিকে তাকায় শাতুনভ। জোরে শ্বাস টানে।

'আচ্ছা বেশ···তাহলে বলছি!'

আবার তেমনি ভাবে তাকিয়ে থাকে চুল্লির গর্তের দিকে; গর্তের মধ্যে আবর্জনা জমে আছে। ভাঙা রুটির-গামলার টুকরো, জ্বালানি কাঠ, ঝাঁটার খেংরা—সব মিলিয়ে মস্ত একটা কালো মুখ ক্লান্তিভরে হাঁ করে আছে যেন; আর মুখের মধ্যে যেন দেখা যাচ্ছে গোটা গোটা খাবার। চাপা স্বরে সে বলতে শুরু করে :

ভল্‌গা নদীর উজানে অনেক দূরে
জঙ্গলের মধ্যে
দুর্দান্ত এক ডাকাত প্রতীক্ষা করছে
মৃত্যুর মুহূর্তটির জন্যে।
ক্ষতবিক্ষত তার বুক—
বুকের উপরে হাত চেপে
জানু পেতে বসে
প্রার্থনা করে ঈশ্বরের কাছে :
হে ঈশ্বর!
আমার এ কলুষিত আত্মাকে
গ্রহণ করো তুমি।
পাপাচারী, অভিশপ্ত বন্দী এ আত্মা!
যৌবনে হতে চলেছিলাম মঠবাসী
তা হতে পারিনি—
আজ আমি দস্যু!

ভরেলা গলার আবৃত্তি। মুখটাকে লুকিয়ে ফেলেছে, পিঠটা ক্রমেই বেঁকে যাচ্ছে বেশি বেশি করে। খালি পা; পায়ের বুড়ো আঙুল আঁকড়ে ধরে আছে। আর কেন জানি পা-টাকে অনবরত শূন্যে ছুঁড়ছে। তাকে দেখে মনে হয়, সে এক ধরনের মন্ত্র পড়ে পড়ে কিছু একটা কুটিল ভেলকি দেখাবার চেষ্টা করছে।

আমি বেঁচেছিলাম দুঃসাহসী জীবনের জন্যে
মিথ্যে দম্ভ ছিল না আমার
আমি বেঁচেছিলাম আত্মাকে যাচাই করবার জন্যে।
আপন শক্তিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছি
প্রশ্ন করেছি আমার আত্মাকে
হে আত্মা, ঈশ্বর তোমাকে কী দিয়েছে?
মঙ্গলময় ঈশ্বর-জননীর দানে
কোন্‌ ঐশ্বর্যে মণ্ডিত তুমি?

আর অন্ধকারের অধীশ্বর শয়তান
কোন্ বীজ বপন করেছে তোমার জমিতে?

'অসিপ, তুমি হচ্ছ একটি আস্ত গর্দভ!' কাঁধদুটো ঝাঁকিয়ে সরু সরু গলায় ধমক দেবার মতো সুরে মনিব হঠাৎ বলে ওঠে, 'তুমি যে কবিতাটা বললে তা একেবারেই খাপছাড়া—বইয়ের কবিতার মতো একেবারেই নয়। তুমি একটা মিথ্যেবাদী! গবেটরাম!'

'ভাসিলি সেমিয়োনিচ, অত অধৈর্য হবেন না! ওকে শেষ পর্যন্ত বলতে দিন!' খানিকটা রুক্ষভাবেই জিপসির মুখ থেকে কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে।

কিন্তু মনিব উত্তেজিত ভাবে বলে চলে:

'এতে নিতান্তই ছোট মনের পরিচয় পাওয়া যায়! তোমার আত্মা, আমার আত্মা··এসব কথা নিয়ে চমৎকার একটা ঘোঁট পাকানো হয়েছে শুধু...আর তারপরেই ভয় পেয়ে হাউ হাউ করে কান্না—হে প্রভু! হে ঈশ্বর! আরে বাবা, ঈশ্বরকে ডাকলে কী ফল হবে? পাপ করবার সময় মনে থাকে না—পরে যতো কিছু ধুকপুকুনি ..'

বলতে বলতে সে হাই তোলে; মনে হয় যেন ইচ্ছে করেই। তারপর মোটা মোটা ভারী গলায় আবার বলে:

'আত্মা আত্মা বলে চেঁচিয়ে লাভ কী! আত্মার কানাকড়িও দাম নেই!'

বাইরের তুষারঝড় যেন লোমশ থাবা বাড়িয়ে জানলার শার্সিগুলোকে আঁকড়ে ধরেছে। মুখটাকে বিকৃত করে মনিব তাকিয়ে দেখে জানলার দিকে, তারপর নিষ্প্রাণ গলায় বলে:

'আমার কথা শুনতে চাও তো বলি। যে লোক নাকি নিজের আত্মা নিয়ে এত বড়ো বড়ো বুলি কপচায় তার আসলে ঘটে একফোঁটাও বুদ্ধি নেই! তাকে যদি বলা হয়: এই দেখ, এই হচ্ছে রাস্তা, এই রাস্তায় চললেই তোমার কাজ হাসিল হবে! শুনে সে কি বলবে জান? বলবে: এতে আমার আত্মার সায় নেই—আত্মাই বলো, বা বিবেকই বলো, বা যা খুশি বলো···হড়েগড়ে সেই একই কথা—যা আত্মা তাই বিবেক। দেখতে হবে মনের জড়তাকে সে কাটিয়ে উঠতে পারছে কিনা। কেউ কেউ সব কিছুকেই

গর্হিত বলে মনে করে—সে আর কি করবে, মঠের সন্ন্যেসী হয়ে বেরিয়ে পড়ে। কারও কারও কাছে কোনো কিছুই গর্হিত নয়—সে হয় ডাকাত! এরা হচ্ছে আলাদা দলের মানুষ—এদের এক করে দেখলে চলবে না! এই দু-দল মানুষকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। যে কাজ করতেই হবে, তা পড়ে থাকবে না⋯আর কাজ যদি করতেই হয় তাহলে বিবেক গিয়ে উনুনের ছাইয়ে মুখ লুকোয় আর আত্মা পাড়া-বেড়াতে বেরিয়ে পড়ে।'

এই বলে, যেন কষ্টেসৃষ্টে শরীরটাকে টেনে তুলছে এমনি ভাবে, সে উঠে দাঁড়ায়, তারপর কারও দিকে না তাকিয়ে ফিরে যায় নিজের ঘরের দিকে।

'এবার তোমরা বরং ঘুমোতে যাও⋯বসে বসে তত্ত্বকথা আলোচনা ঢের হয়েছে। হুঁঃ, আত্মা! ভগবানের নাম নেওয়াটা তো সহজ কাজ, ডাকাত হওয়াটাও এমন কিছু মস্ত কাজ নয়! এসব কথা ছেড়ে দিয়ে যা-হোক কিছু করতে চেষ্টা করো তো দেখি! বুঝলে হে নরকের কীটরা? এ্যাঁ?'

দরজাটাকে ঠাস করে বন্ধ করে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন শাতুনভকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে জিপসি বলে:

'কই হে, বলে যাও শুনি!'

অসিপ মাথা তোলে, সবার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়, তারপর শান্তভাবে বলে:

'লোকটা মিথ্যেবাদী।'

'কে? মনিব?'

'হ্যাঁ। লোকটার আত্মা ঠিকই আছে। তবে আত্মায় শান্তি নেই। আমি জানি!'

'এসব কথা নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে!⋯তুমি যা বলছিলে তাই বরং বলো।'

অসিপ হঠাৎ নড়ে ওঠে. চুল্লির গর্ত থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসে, প্রকাণ্ড মাথাটা ঝাঁকায়, তারপর টলতে টলতে এগিয়ে চলে।

'কথাগুলো এখন আর মনে করতে পারছি না⋯'

'বাজে কথা বোলো না তো!'

'সত্যিই তাই। আমি ঘুমোতে যাচ্ছি।'

'নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না···একটু মনে করতে চেষ্টা করে দ্যাখো না!'

'না, ঘুমোতে যাবার সময় হয়ে গেছে···'

অন্ধকার থেকে খসখসানির শব্দ আসে। তারপর শোনা যায় অসিপের শান্ত গলা:

'ভাইসব, এ কী জীবন আমাদের! পচা, নোংরা···'

আর্তেম বিড বিড করে বলে, 'ভাগ্যিস বললে! আমরা তো আর জানতাম না—তবু যা হোক তোমার কাছ থেকেই শোনা গেল!'

জিপ্‌সি পরিপাটি করে নিজের জন্যে একটা সিগারেট পাকিয়ে নেয় তারপর ফিসফিস করে বলে:

'এই সংসারে চলবার পক্ষে লোকটা একটু কমজোরী···'

ফেব্রুয়ারি মাসের তুষারঝড় ককিয়ে উঠছে আর গোঁ গোঁ আর্তনাদ করছে। আছড়ে পড়ছে জানালার ওপরে। প্রাণ-কাঁপানো হুঙ্কার ছাড়ছে চিমনির মধ্যে ঢুকে। কারখানা-ঘরে ছোট একটা তেলের বাতি জ্বলে; সেই বাতির আলোয় ঘরের থমথমে বিষণ্ণতার প্রায় সবটুকুই থেকে যায় এবং আলতোভাবে পাক খেতে থাকে। কোথা থেকে যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের স্রোত ঢুকছে, জড়াজড়ি করে আছে পায়ের কাছে। আমি ময়দা ঠাসছি, আর মনিব বসে আছে সিন্দুকের কাছে একটা ময়দার বস্তার ওপরে। বলছে:

'শোনো হে, বয়স থাকতে থাকতেই জগতটাকে উলটে-পালটে দেখে নাও। বিশেষ কোনো একটা কাজে বাঁধা পড়বার আগেই সেরে নিও কাজটা। মনে মনে ভেবে দ্যাখ, কি কি ধরনের কাজ তোমার পক্ষে পাওয়া সম্ভব হতে পারে—হয়তো এমন কিছুও পেয়ে যেতে পার যা তোমার পক্ষে ঠিক লাগসই হবে···তাড়াহুড়ো করবার দরকার নেই—শুধু ভেবে দেখ···'

হাঁটুদুটোকে ফাঁক করে ছড়িয়ে দিয়ে বসে আছে সে। তার এক হাঁটুর ওপরে রয়েছে 'ক্বাস' পানীয়ের একটি পাত্র, অপর হাঁটুতে একটি গ্লাস। গ্লাসের আধাআধি মরচে-রঙের পানীয়। তার নিরবয়ব মুখটা ঝুঁকে আছে মাটির মতো কালো মেঝের দিকে; সেই মুখের দিকে মাঝে মাঝে আমি আড়চোখে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছি আর ভাবছি :

'আমাকেও না হয় খানিকটা ক্বাস খেতে দিতে...'

মনিব মাথা তোলে, কান পেতে বাইরের গোঙানি শোনে, তারপর চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার বাপ-মা আছে

'আপনি একথা আমাকে আগেও জিজ্ঞেস করেছেন...'

'ইস্, কি ঝাঁজ তোমার গলার স্বরে,' মাথাটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বলে, 'যেমন গলার স্বর, তেমনি মুখের ভাষা...'

কাজ শেষ করে আমি হাত ধুচ্ছিলাম। সার হাতে ময়দার লেই শুকিয়ে গুটলি পাকিয়ে আছে; ঘষে ঘষে তুলছিলাম সেগুলো। সে ক্বাস খায়, শব্দ করে করে ঠোঁট চাটে, তারপর গ্লাসটাকে আরেকবার ভর্তি করে নিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে :

'নাও হে, খেয়ে ফেল!'

'ধন্যবাদ।'

'হ্যাঁ, আমি দিচ্ছি তোমাকে—খেয়ে ফেল! কাজের লোককে আমি চিনি হে। কাজ কি-ভাবে করতে হয় তা যে জানে, তার সুবিধে অসুবিধের দিকে আমিও সব সময়ে নজর রাখি। এই ধরো না কেন পাশকার কথা। লোকটা বড়ো বড়ো কথা বলে, লোকটা হচ্ছে চোর—কিন্তু তবুও আমার কাছে তার কদর আছে। নিজের কাজকে সে ভালবাসে, সারা শহরে ওর মতো ভালো মিস্ত্রী আর নেই! যে লোক কাজ করতে ভালবাসে, তাকে সব রকমের সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে বৈকি। সেটুকু তার পাওনা। আর মরলে পরে খানিকটা শ্রদ্ধাও তাকে দিতে হবে। এই হচ্ছে সাফ কথা!'

সিন্দুকটা বন্ধ করে আমি যাই আগুন জ্বালাতে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ

করে মনিবও উঠে দাঁড়ায়; আলতো ভাবে পা ফেলে ফেলে ধোঁয়াটে একটা পিণ্ডের মতো নিঃশব্দে আসে আমার পিছনে পিছনে; বলে:

'কোনো লোক যখন ভালো কাজ করে তখন তার হাজারটা দোষ ক্ষমা করা যায়···ভালোটুকুই টিকে থাকে···যেটুকু মন্দ তার কোনো চিহ্ন থাকে না—মানুষের সঙ্গে সঙ্গে তা মরে যায়···'

চুল্লির গর্তের মধ্যে পা ঝুলিয়ে দিয়ে সে মেঝের ওপরে থপ্ করে বসে, ক্বাস-এর পাত্রটা রাখে নিজের পাশটিতে, তারপর মাথাটা নিচু করে চুল্লির আগুন দেখে।

'আরো কাঠ দাও হে—দেখতে পাওনা নাকি!'

'যথেষ্ট কাঠ দেওয়া আছে। সমস্তই শুকনো কাঠ; আর অর্ধেকটা হচ্ছে বার্চগাছের কাঠ···'

'বটে!···'

খিক্ খিক্ করে পাতলা একটু হাসি বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে। আমার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলে:

'তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে হে! ভেবো না যে আমি সেটুকু বুঝি না! ঠিক আছে! তোমাকে সবকিছুর খবরদারি করতে হবে—এই যেমন ধরো কাঠ, ময়দা বা এমনি সব···'

'আর মানুষ নয়?'

'ব্যস্ত হচ্ছ কেন? মানুষের কথাতেও আসা যাবে। শোনই না আমি কি বলি। খারাপ কিছু শেখাচ্ছি না হে।'

বুকের ওপরে চাপড় মারে; বুকটাও ভুঁড়ির মতোই মোটা ও বিরাট। বলে:

'ভিতরে ভিতরে আমি লোকটা খুবই ভালো—বুঝলে হে। দিল্ আছে আমার। তুমি এখনো নিতান্তই ছোকরা, বুদ্ধিশুদ্ধি পাকেনি তাই কথাটা বুঝতে পারছ না। তাহলেও কথাটা তোমার জানা উচিত। তোমাকে বলি শোন, মানুষ আর সৈনিকের উর্দীর বোতাম এক জিনিস নয়; মানুষের চকচকানিটা অন্য জাতের—অমন মুখ বেঁকাচ্ছ কেন?'

'ঘুমোতে যাবার সময় হয়েছে যে! আপনার জন্যে আমি ঘুমোতে যেতে পারছি না—আপনার কথাগুলো শুনতে ভালোই লাগছে আমার…'

'তা যদি লেগে থাকে তবে আর ঘুমোতে যাবার দরকার কি! যখন তুমি নিজেই মনিব হয়ে বসবে তখন ঘুমোবার সময় ঢের পাবে…'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার সে বলে :

'নাঃ, তুমি কোনোকালে মনিব হতে পারবে বলে মনে হয় না…ব্যবসাবুদ্ধি তোমার নেই…বড়ো বেশি কথা বলো তুমি…কথা বলে বলেই নিজেকে তুমি শেষ করবে…হাওয়ায় গা ভাসিয়েই যাবে ফুরিয়ে…কাজের কাজ তোমার দ্বারা কিছু হবে না…কারও এতটুকু উপকার করতে পারবে না তুমি।'

ফোঁস করে তীব্র একটা শ্বাস টেনে নিয়ে সে হঠাৎ রীতিমতো ঝাঁজের সঙ্গে কুৎসিত গালাগালি দিয়ে ওঠে। মুখটা থর থর করে কাঁপছে—পাত্রের ওপরে রাখা যইয়ের জেলি আচমকা নাড়া খেয়ে যেমনভাবে কেঁপে ওঠে। সারা শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা রাগের দমক বয়ে যাচ্ছে যেন। লাল হয়ে উঠেছে মুখ ও ঘাড়, চোখের মণিদুটো ফুলে উঠেছে হিংস্রভাবে। আমি দেখছি, ভাসিলি সেমিয়োনভ—আমাদের মনিব—কেমন এক অদ্ভুত আর চাপা গলায় হুঙ্কার তুলছে—বাইরের তুষার ঝড়ের ককানিকে নকল করতে চাইছে যেন। বাইরেও তুষারঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে গোটা পৃথিবীর করুণ বিলাপ।

'একদল সৎ আর বিশ্বাসী লোক পেতাম যদি! দেখে নিতাম তাহলে! ব্যবসা কাকে বলে, তা দেখিয়ে দিতাম সবাইকে! গোটা জেলাকে, গোটা ভল্গা নদীকে কাঁপিয়ে তুলতাম!…কিন্তু তেমন লোক পাওয়া যায় না! সকলেই বেহুঁশ…কারও মুখে শুধু নিজেদের দুঃখের প্যানপ্যানানি, আর কারও বা এতটুকু বুকের পাটা নেই…আর কর্তাব্যক্তিদের কথা যদি বলো, ওরা হচ্ছে শয়তান…'

মোটা মোটা থ্যাবড়া হাতের মুঠি পাকিয়ে আমার মুখের সামনে নাড়তে থাকে। তারপর মুঠি খুলে আঙুলগুলোকে টান করে মেলে দেয়, থাবা বাড়িয়ে বাতাসকেই আঁকড়ে ধরতে চায় যেন। মনে হয়, কারও চুলের মুঠি

ধরে আছে সে, টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসছে, টেনে টেনে চুল ছিঁড়ে ফেলছে। একটা ক্ষুধার্ত হিস্-হিস্ শব্দ তুলে আর সারা মুখে ফেনা তুলে কথা বলে চলেছে অনবরত :

'প্রথমে দেখে নিতে হবে, কোন্ মানুষটার ঝোঁক কোন্দিকে। এটা দেখে নিতে হবে মানুষটার বয়স অল্প থাকতে থাকতেই—বয়স বেড়ে যাবার আগেই। মানুষটাকে ধরে-বেঁধে পুরনো কাজে লাগিয়ে দিলেই চলে না। তা করলে কি হয় জান ? দেখা যাবে, আজ যে মস্ত বড়ো ব্যবসাদার, কাল সে রাস্তার ভিখিরি। আজ যে রুটির কারখানায় মালিক, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই দেখা যাবে, সে অন্য লোকের চুল্লির কাঠ চেলা করছে।···বাপু হে, এটা তো আর পাঠশাল্ নয় যে রামা-শ্যামা-যদু-মধু সবাইকে ধরে ধরে ঢুকিয়ে দিলেই হল—যা, শেখ্ গিয়ে! ভেড়ার পালকে যেমন একই কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দেওয়া হয়—এ ব্যাপারটাও তেমনি!···আরে বাবা, মানুষটাকে একটা সুযোগ দিতে হবে তো, যাতে সে নিজের ঝোঁকটা বুঝতে পারে, জানতে পারে সে কী চায়!'

বলতে বলতে আমার হাতটা আঁকড়ে ধরেছে। আমাকে নিজের দিকে টেনে নেয়, তারপর ঝাঁজালো স্বরে হিসিয়ে ওঠে

'আর ঠিক এই কথাটাই তোমাদের চিন্তা ও আলোচনা করা উচিত। যার যেমন খুশি থাকবে, যার যেমন ক্ষমতা চলবে—তা হতে পারে না। ওপরওয়ালা যেমন হুকুম করে তেমনি ভাবে চলতে হবে সবাইকে।··· আর হুকুম করবার এক্তিয়ার কার আছে? যে আসলে কাজগুলোকে চালাচ্ছে—তার। হুকুম দেবার এক্তিয়ার আমার আছে, কে কোন্ কাজ করবে তা দেখতে পারি শুধু আমি!'

তারপর আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হতাশার ভঙ্গিতে হাত নাড়ে।

'সরকারী কর্মচারীরা যদি সব ব্যাপারে নাক গলাতে আসে তাহলে কক্ষনো কোনো ভালো ফল হতে পারে না। সত্যিকারের কাজ তাতে ভণ্ডুল হয়ে যায়! তার চেয়ে সমস্ত ছেড়েছুড়ে দিয়ে বনেজঙ্গলে পালিয়ে যাওয়া ভালো। হ্যাঁ, পালিয়ে যাওয়া!'

গোল শরীরটাকে দোলাতে দোলাতে সে টানা টানা অস্পষ্ট স্বরে বলে চলে:

'সত্যিকারের মানুষ পাওয়া যায় না। সবাই পোঁ ধরা, কারও এতটুকু বুকের পাটা নেই! সব হুকুম মাফিক চলা! যদি বলা হয়—যাও! তাহলে সে যাবে! থাম! থামবে। ঠিক যেন একদল সেপাই। এমন কি যদি কোনো শয়তানি করবার মতলব আঁটে তাহলেও সেপাইদের মতো কায়দা! এভাবে কখনো তল পাওয়া যায় না···আর আমি জোর করে বলতে পারি, স্বর্গ থেকে ভগবান এই হট্টগোলের দিকে তাকিয়ে দেখছেন আর ভাবছেন: নাঃ, এই বোকার দলকে নিয়ে আর পারা যায় না···এদের দিয়ে পৃথিবীর এতটুকু উপকার হবে না···'

'আপনি নিজেও কি মনে করেন যে আপনার দ্বারা পৃথিবীর কোনো উপকার হচ্ছে না?'

তার শরীরটা তেমনি দুলতে থাকে। এ প্রশ্নের জবাব সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না।

'আমার কথা জিজ্ঞেস করছ? আমার কথা?···সব ফুলকি থেকেই আগুন জ্বলে উঠবে, তা তো আর হয় না। অনেক সময় তা শুধু একটা ঝলক তুলেই শেষ হয়ে যায়।···দু কুড়ি বয়স হয়ে গেল আমার, পুরো দু কুড়ি—আমার মরণকালের আর দেরি নেই, মদ খেতে খেতেই মরতে হবে আমাকে। লোকে মদ খায় কেন? শোকতাপ ভুলবার জন্যে। শোকতাপ হচ্ছে···যাক্ গিয়ে সে কথা। আমার যুগ্যি কাজ কি আমি পেয়েছি? মোটেই না। হাজার দশেক লোকের একটা ব্যবসা চালাবার ক্ষমতা আছে আমার! এমন এক হৈচৈ কাণ্ড বাধিয়ে তুলতে পারি যে দেশের শাসনকর্তার পর্যন্ত টনক নড়বে!'

তার সবুজ চোখটায় গর্বের দীপ্তি ফুটে উঠেছে; কটা চোখটা মিটমিট করে তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে। তারপর দু-হাতে প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে চলে:

'এটুকু আমার কাছে কী?' একটা ইঁদুর-ধরা কলের মতো। জনা ছয়েক চালাক-চতুর আর সৎ লোক যোগাড় করে দাও দিকি! তাহলে

দেখে নিও কী তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুলি! এমন কি সৎ লোক যদি নাও হয় তো ক্ষতি নেই—অন্তত জনা ছয়েক ধূর্ত চোর! তাহলেও হবে।··· হুঁঃ, কাজের কথা বলতে এসেছ আমার কাছে! মস্ত এক ব্যবসা হবে—সবাই হকচকিয়ে তাকিয়ে থাকবে—ভেবে না বোঝা গেল, কিছু একটা হচ্ছে।···'

ক্লান্ত হয়ে সে শুয়ে পড়ে, নোংরা মেঝের ওপরে টান করে নিজেকে মেলে দেয়. ধোঁৎ ধোঁৎ শব্দে শ্বাস টানে, চুল্লির গর্তের মধ্যে পা দুটো ঝুলিয়ে দেয় আর উচ্ছল আগুনের আভায় লাল-হয়ে-ওঠা পা দুটো দোলাতে থাকে।

তারপর হঠাৎ একসময়ে ফুঁসিয়ে ওঠে:

'মেয়েদেরও চাই!'

'মেয়েদের কথা কী বলছেন?'

সিলিংয়ের দিকে কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থাকে মনিব, তারপর উঠে বসে, বিষণ্ণ গলায় বলে:

'মেয়েরা যদি জানত যে তাদের ছাড়া পুরুষের কাজ চলে না—কী ভালোই না হত তাহলে। মেয়েদের পাশে পেলে যে-কোনো কাজকে একটা বিরাট ব্যাপার করে তোলা যায়···কিন্তু মেয়েরা এসব কথা বোঝে না! পুরুষকে চলতে হয় একেবারেই একা একা···নেকড়ের মতো জীবন তাদের!··· শীত আর অন্ধকার রাত্রি···জঙ্গল আর বরফ! ভেড়া খেয়ে উদরপূর্তি করা··· কিন্তু পোড়া কপাল তার···জ্বালাযন্ত্রণা শেষ হয় না···বসে বসে ককায়···'

বলতে বলতে সে কেঁপে উঠেছে। তারপর তাড়াতাড়ি চুল্লির দিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমার দিকে তাকায় কটমট করে, সঙ্গে সঙ্গে মনিবোচিত ঝাঁজ আসে তার গলার স্বরে, হুঙ্কার দিয়ে ওঠে:

'হাঁ করে তাকিয়ে আছ কি? কয়লাগুলো একটু খুঁচিয়ে দাও না! কান খাড়া করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেই কাজ হয়ে যাবে!···'

চুল্লির তলা থেকে হাঁসফাঁস করতে করতে উঠে এসেছে। তারপর বহুক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে জানলার বাইরের দিকে; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

কোমর চুলকোয়। জানলার শার্সির ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে, বাইরে একটা হু-হু করা সাদা শূন্যতা পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে। কালি-পড়া চিমনির ভিতর দিয়ে তেলের বাতির হলদে শিখাটাকে প্রায় দেখাই যায় না; দেওয়ালের গায়ে ফট্ ফট্ করে বিচিত্র সব আওয়াজ ওঠে।

মনিব বিড়বিড় করে বলে, 'হায় ভগবান, হায় ভগবান!' বলতে বলতে ন্যাকড়ার চটিটা টেনে টেনে ঘষতে ঘষতে এগিয়ে যায় বিস্কুটের কারখানার দিকে। খিলান পেরিয়ে যাবার পরে অন্ধকারের মধ্যে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়। মনিব চলে যাবার পরে আমি রুটিগুলোকে চুল্লির মধ্যে সাজিয়ে রাখি এবং ঘুমে ঢুলতে শুরু করি।

মাথার ওপর থেকে শোনা যায় একটা পরিচিত গলার স্বর: 'দেখো হে, বেশি ঘুমিও না যেন, ঠিক সময়টিতে যেন ঘুম ভাঙে।'

পিঠের দিকে হাত রেখে মনিব দাঁড়িয়ে। মুখে জল লেগে আছে, শার্টটা ভিজে ভিজে।

'দারুণভাবে বরফ পড়ছে···চাঁই হয়ে জমে আছে...সারা উঠোন ঢাকা পড়ে গেছে বরফে···'

আকর্ণবিস্তৃত হাঁ করে মুখটাকে বেঁকিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে আমার দিকে, তারপর আস্তে আস্তে বলে:

'দেখে নিও, এমন এক সময় আসবে যখন ঠিক এমনিধারা বরফ পড়বে সারা হপ্তা ধরে, সারা মাস ধরে, সারা শীত ও গ্রীষ্ম ধরে··· পৃথিবীর সমস্ত কিছু চাপা পড়ে যাবে···হাজার খোঁড়াখুঁড়ি করেও তখন আর কোনো লাভ হবে না···দেখে নিও, তাই হয় কিনা! ব্যাপারটা কিন্তু মন্দ হবে না! যেখানে যতো বোকাহাঁদা আছে সবগুলো সরাসরি খতম হয়ে যাবে···'

হেলতে দুলতে দেওয়ালের দিকে এগিয়ে যায়; একটা আড়াই-মণি ওজন যেন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। ধোঁয়াটে ধুমসো শরীরটা টেনে টেনে নিয়ে যায় দেওয়ালের দিকে, এদিক ওদিক চলাফেরা করে, তারপর এক সময়ে অদৃশ্য হয়ে যায়···

রোজ সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একঝুড়ি টাটকা মিষ্টি-রুটি নিয়ে যেতে হয় একটা শাখা দোকানে। মনিবের সবশুদ্ধ তিনজন উপপত্নী; তিনজনের সঙ্গেই পরিচয় হয়ে যায় আমার।

এদের মধ্যে একজনের বয়স কম; সেলাইয়ের কাজ করত। মাথায় কোঁকড়ানো চুল, গোলগাল ছোটখাটো চেহারা। পরনে গায়ের সঙ্গে-আঁট-হয়ে-লেগে-থাকা ছাইরঙা মামুলি পোশাক। একজোড়া ভাবলেশহীন নিষ্প্রভ চোখের দৃষ্টি মেলে পৃথিবীর দিকে অলসভাবে তাকিয়ে থাকে। ফ্যাকাশে মুখটাকে দেখে বিধবাদের মতো দুঃখিনী মনে হয়। এমন কি আড়ালেও কর্তার সম্পর্কে কথা বলে চুপি চুপি, ভয়ে ভয়ে; নাম উল্লেখ করবার সময়ে পৈতৃক পরিচয় সমেত পুরোপুরি খৃষ্টীয় নামটি উচ্চারণ করে। আমি যে সব মাল পৌঁছে দিই সেগুলি মিলিয়ে নেবার সময়ে এমন একটা হাস্যকর রকমের ব্যতিব্যস্ততার ভাব দেখায় যে মনে হতে পারে সে চোরাই মাল ঘরে তুলছে।···

আর আদুরে আদুরে স্বরে বলে, 'ওরে আমার সোনার মিঠেরুটি রে··· ওরে আমার পিঠেপুলি রে!···'

অপরজনের বয়স প্রায় ত্রিশ। লম্বা গড়ন, পরিচ্ছন্ন চেহারা, অতি পরিপুষ্ট ধর্মভাবাপন্ন মুখ। তীক্ষ্ণ চোখদুটিকে বিনীতভাবে মাটির দিকে নামিয়ে রাখে, মধুক্ষরা বিনীত গলার স্বর। আমার কাছ থেকে মাল নেবার সময়ে সে আমাকে গুনতিতে ঠকাতে চেষ্টা করে। আমার স্থির বিশ্বাস, আজ হোক কাল হোক, এই স্ত্রীলোকটিকে কয়েদীর ডোরাকাটা পোশাক গায়ে চড়াতেই হবে; তার তন্বী এবং বাইরে থেকে দেখে যেটা মনে হয়—নিরুত্তাপ শরীরকে ঢাকা দেবে কয়েদীর পোশাকে আর জেলখানার স্যাঁৎসেঁতে আলখাল্লায়; চুলে বাঁধবে সাদা রুমাল।

দুজনের একজনকেও আমার ভালো লাগে না। আর এই ভালো-না-লাগাটা এত বেশি প্রবল যে তা কাটিয়ে ওঠা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। কাজেই আমি সব সময়ে চেষ্টা করি, মালগুলো তৃতীয় স্ত্রীলোকটির হাতে পৌঁছে দিতে। এই দোকানটি যাতায়াতের রাস্তার বাইরে এক

বেখাপ্পা জায়গায়। কিন্তু এই অদ্ভুত স্ত্রীলোকটির কাছে যেতে আমার ভালো লাগে। আর অন্ত ছেলেরা খুশি হয়েই এই স্ত্রীলোকটির কাছে মাল পৌঁছে দেবার ভার আমার ওপরেই ছেড়ে দেয়।

তার নাম সোফিয়া প্লাখিনা। মোটাসোটা চেহারা, গোলাপের মতো লাল গাল। সব মিলিয়ে তার সম্পর্কে এই ধারণাই হয় যে সে যেন কয়েকটা টুকরো দিয়ে তৈরি ; কতগুলি কিম্ভূতকিমাকার এলোমেলো জিনিস থেকে তাড়াতাড়ি তাকে গড়ে তোলা হয়েছে।

মাথায় একরাশ ঢেউ-তোলা চুল, ইহুদি মেয়েদের মতো নিকষ কালো ; আর তাতে কোন সময়েই চিরুনি পড়ে না। ফোলা ফোলা লাল গাল দুটির মাঝখানে বেখাপ্পা বাকা নাক। চোখদুটি অসাধারণ ; কাচের মতো স্বচ্ছ সাদা অংশের ওপরে ঘোর বাদামী রঙের মণি বড়ো অদ্ভুতভাবে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, আর তাতে ফুটে আছে শিশুর মতো খুশির ঝিকিমিকি। অভিমানে ঠোঁট-ফুলনো ছোট্ট মুখখানাও শিশুর মতোই। পুরু চিবুকটার বিশেষ কোনো আকার নেই ; চিবুকটা গিয়ে ঠেকেছে বুকের সঙ্গে। মোটা মেয়েমানুষের পুরোপুরি বাড়ন্ত বুক যেমন বিশ্রীরকমের উঁচু হয়ে থাকে—তার বুকও তেমনি। অপরিচ্ছন্ন, সব সময়েই নোংরা আর ময়লা, ব্লাউজে বোতাম থাকেনা ; খালিপায়ে শুধু স্লিপার;—এই হচ্ছে সে। দেখে মনে হয়, বছর ত্রিশেক বয়স। তবে সে নিজে কিন্তু ভাঙা ভাঙা রুশভাষায় বলে, তার বয়স মাত্র 'আথায়ো'। সে এসেছে বারোনস্ক থেকে, বাপ-মা-হারা অনাথ মেয়ে; মনিবের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এক বেশ্যালয়ে। বেশ্যালয়ে তাকে কেন যেতে হল, তা তার নিজের ভাষায় এইভাবে বলে :

'ব্যাপারটা হচ্ছে এই! মার পেট থেকে তো আমার জন্ম হল। তারপর মা গেল মরে। বাবা বিয়ে করল এক জার্মান মেয়েমানুষকে। তারপর বাবাও গেল মরে। জার্মান মেয়েমানুষটা বিয়ে করল এক জার্মান পুরুষকে। এইভাবে আমার আরেকজন মা ও আরেকজন বাবা হল। দুজনের কেউ-ই আমার নিজের মা-বাবা নয়! দুজনে কী

মদটাই না খেত। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকত। আমার বয়স তখন তেরো হয়ে গেছে। আমার শরীরটা বরাবরই ছিল মোটা—তাই জার্মান পুরুষটা আমার পিছনে লাগে। আমার মাথায় আর পিঠে দমাদম কি মারটাই না লাগাত! তারপর সেই জার্মান পুরুষটা আমার সঙ্গে থাকে আর আমার পেটে বাচ্চা হয়। তারপর তারা ধার শোধ করবার জন্যে বাড়িঘর বেচে দিয়ে সমস্ত কিছু ফেলে ছড়িয়ে পালিয়ে যায়। আমি একজন মেয়েলোকের সঙ্গে জাহাজে চেপে চলে আসি খালাস হতে। ভালো হয়ে ওঠার পর তারা আমাকে পাঠিয়ে দেয় সেই বাড়িটায়··· সেখানে কী জঘন্য ব্যাপার সব··· জাহাজে চেপে যখন আসছিলাম শুধু সেই কয়েকটা দিনই খুব ভালো লেগেছিল···'

আমাদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হবার পরে এসব কথা আমি তার মুখে শুনেছিলাম। আর বড়ো অদ্ভুত ভাবে আমাদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছিল।

এই স্ত্রীলোকটির মুখটা বেখাপ্পা, ভালো করে কথা বলতে পারে না, হাবভাব আদুরে আদুরে, এতবেশি বকবক করে যে অসহ্য মনে হয়—স্ত্রীলোকটিকে আমার ভালো লাগত না। দ্বিতীয়বার যখন আমি মালা পৌঁছে দিলাম, সে হেসে বলেছিল:

'মনিবকে কাল ঘর থেকে বার করে দিয়েছি। মুখে আঁচড়ে দিয়েছি। দেখেছ না?'

আমি দেখেছিলাম—এক গালে তিনটে আঁচড়ের দাগ, আরেক গালে দুটো। কিন্তু স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কথা বলবার প্রবৃত্তি আমার ছিল না, সুতরাং আমি চুপ করে রইলাম।

সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি বোবা নাকি? না, কালা?'

তবুও আমি নির্বাক্। আমার মুখের কাছে মুখ এনে সে বলল:

'হাঁদারাম!'

সেবারে এ-পর্যন্তই। পরের দিন আমি ঝুড়ির পাশে বসে আছি, বসে বসে শুকিয়ে-যাওয়া ও ছাতা-পড়া অবিক্রীত রুটিগুলোকে একপাশে সরিয়ে

রাখছি—সে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার পিঠের ওপরে, ক্ষুদে ক্ষুদে নরম হাতদুটো দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে চিৎকার করতে লাগল :

'পিঠে তোল দেখি আমাকে !'

আমি বিরক্ত হলাম। তাকে বললাম আমাকে ছেড়ে দিতে। কিন্তু সে আরও জোরে আমাকে আঁকড়ে ধরল আর বারবার বলতে লাগল :

'আমাকে পিঠে তোল তো দেখি…'

'ছেড়ে দাও বলছি, নইলে তোমাকে আমার মাথার ওপর দিয়ে পাক খাইয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেব…'

সে জবাব দিল, 'না, তা তুমি করতে পার না ! আমি মেয়েমানুষ না ! মেয়েমানুষ যেমনটি চায় তেমনটি করতে হয় ! তোল তো দেখি পিঠে !'

তার তেলতেলে চুলের মাতোয়ারা গন্ধে দম বন্ধ হয়ে অসে। তার সারা গায়ে তেলা-তেলা কেমন একটা বিশ্রী গন্ধ—ঠিক একটা পুরনো ছাপার যন্ত্রের মতো।

মাথার ওপর দিয়ে পাক খাইয়ে আমি তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তার পা-টা গিয়ে ঠোক্কর খেল দেওয়ালের সঙ্গে। তারপর সে কাঁদতে শুরু করল ; শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে করুণ কান্না আর বিলাপ।

তাকে দেখে আমার যেমন কষ্ট হতে লাগল, তেমনি নিজের ব্যবহারেও আমি লজ্জিত হলাম। আমার দিকে পিঠ ঘুরিয়ে মেঝের ওপরে সে বসে আছে। পরনের স্কার্টটা উল্‌টে গিয়েছিল, এখন নিজেকে নড়িয়ে চড়িয়ে স্কার্টটাকে টেনে দিচ্ছে মসৃণ পায়ের ওপরে। তার এই বিবস্ত্রা অবস্থার মধ্যে কোথায় যেন একটা অসহায়তা আছে যা মনকে স্পর্শ করে। পা থেকে স্লিপারদুটো খসে পড়েছে, আর ক্ষুদে ক্ষুদে খালি পায়ের বুড়ো আঙুলদুটোকে সে নাড়াচ্ছে। বিশেষ করে এই দৃশ্যও মনকে স্পর্শ করে।

'আমি তো তোমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম।' লজ্জা পেয়ে আমি বললাম, তারপর হাত ধরে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম তাকে। হাত-পা ছুঁড়ে সে ককাতে লাগল।

'কী দুষ্টু ছেলেরে বাবা…'

তারপর হঠাৎ মেঝের ওপরে পা ঠুকে অন্তরঙ্গ হাসি হেসে চেঁচিয়ে বলে উঠল :

'চুলোয় যাও, উচ্ছন্নে যাও—দুর হয়ে যাও এখান থেকে !'

আমি তাড়াতাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। মনের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছিল, নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছিল আমার। বাড়ির ছাদে ছাদে রাত্রির ধোঁয়াটে অবশেষ গলতে শুরু করেছে, কুয়াশাম্লান সকাল আসছে একটু একটু করে। রাস্তার হলদে বাতিগুলো এখনো নেবানো হয়নি ; নিঃশব্দতার রাজ্যে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে বাতিগুলো।

রাস্তার দিকের দরজাটা খুলে পিছন থেকে স্ত্রীলোকটি চিৎকার করে বলল, 'শুনে যাও গো ! ঘাবড়ে যেও না যেন, মনিবকে আমি কিচ্ছু বলব না !'

দিন দুয়েক পরে আবার আমাকে যেতে হয়েছিল মাল পৌঁছে দেবার জন্যে। একগাল হেসে সে আমাকে সম্বর্ধনা জানায়, তারপর হঠাৎ কি মনে পড়তেই জিজ্ঞেস করে :

'তুমি পড়তে জান ?'

তারপর টাকাপয়সা রাখবার ডেস্ক্-এর একটা দেরাজ থেকে চমৎকার একটা থলিয়া বার করে একটুকরো কাগজ টেনে বার করল :

'পড়ো তো দেখি !,

পরিষ্কার হাতের লেখায় একটা কবিতা লেখা রয়েছে। প্রথম দুটি লাইন আমি পড়লাম :

তহবিল তছরূপে কুখ্যাত বাবা আমার,
চুরি করেছে কমপক্ষে পঞ্চাশটি হাজার…

আমার হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে সে বলল, 'ইস্, পশুরও অধম !' তারপর ঘৃণামিশ্রিত স্বরে দ্রুত বলে চলে :

'এটা আমার কাছে লিখেছে এক হতচ্ছাড়া বেআক্কেলে ! আর ছেলেটা ধড়িবাজও বটে। পড়াশুনো করে। ছাত্রদের খুবই পছন্দ করি আমি। ওরা হচ্ছে পল্টনী অফিসারের মতো। এই ছাত্রটি আমার সঙ্গে প্রেম করতে আসে। নিজের বাপের সম্পর্কে কি-রকম লিখেছে দ্যাখ। ওর বাপ হচ্ছে

একটা কেউকেটা লোক। মুখে সাদা দাড়ি, বুকে মেডেল, রাস্তায় বেরোয় একটা কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে! তবে হ্যাঁ, বুড়ো যখন কুকুর নিয়ে রাস্তায় বেরোয় আমার বাপু পছন্দ হয় না। সঙ্গে নিয়ে বেরোবার মতো আর কেউ নেই নাকি? আর তার নিজের ছেলেই তাকে যা-তা বলছে—বলে কিনা চোর! লিখে পর্যন্ত দিয়েছে—এই তো!'

'তাতে তোমার কি আসে যায়?'

'হায় রে!' বলতে বলতে তার চোখদুটো ব্যথায় বড়ো বড়ো হয়ে ওঠে, 'নিজের বাপের নামে যা-তা বলাটা কি উচিত কাজ! এদিকে নিজে তো নষ্ট চরিত্রের মেয়েলোকের সঙ্গে চা-খানায় ঢুকছে···'

'কার সঙ্গে?'

'কার সঙ্গে আবার! আমার সঙ্গে!' অবাক হয়ে ঝাঁজের সঙ্গে সে বলে ওঠে, 'এমন আহাম্মকের মতো প্রশ্ন করো তুমি!'

আমাদের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠল তাকে বলা যেতে পারে এক অদ্ভুত ধরনের ওপর-ওপর অন্তরঙ্গতা। এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে আমরা কথা বলি না। কিন্তু আমরা একে অপরের কথা বুঝতাম কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। মাঝে মাঝে আমার কাছে সে এমন সব গোপন কথা বলত—খুব বেশি রকমের গুরুত্ব দিয়ে এবং খুঁব খুটিয়েই বলত—যেগুলো নিতান্তই মেয়েলি ব্যাপার। শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই আমার চোখ মাটির দিকে নেমে যেত আর আমি ভাবতাম:

'ব্যাপারটা কি? ও কি আমাকে মেয়েলোক বলে ধরে নিয়েছে নাকি?'

আসলে কিন্তু তা নয়। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হবার পরে সে কখনো অপরিচ্ছন্ন ভাবে আমার কাছে আসেনি। তার ব্লাউজের বোতামগুলো ঠিকভাবে লাগানো থাকত, বগলের তলার ফুটোগুলো সেলাই করে নিত, এমন কি পায়ে মোজা পরে আসত। মুখে থাকত দরদভরা হাসি। আমার কাছে এছে বলত:

'ঠিক সময়ে এসে গেছ! সামোভারে জল ফুটছে!'

আলমারির পিছনে বসে আমরা দুজনে চা খেতাম। সেখানে তার

আসবাব বলতে ছিল সরু একটা খাট, দুটো চেয়ার, একটা টেবিল, আর বিশ্রী রকমের ধুমসো একটা দোরাজওলা সিন্দুক। সবচেয়ে তলার দেরাজটা কিছুতেই বন্ধ হত না। দোরাজের কোণায় ঠোকর খেয়ে সোফিয়ার পায়ে অনবরত চোট লাগত, আর প্রত্যেকবারই সে সিন্দুকের ওপরে একটা চাপড় মেরে, পায়ের চোট লাগা জায়গাটার ওপরে অন্য পা দিয়ে ঘষতে ঘষতে, গোলাগালি দিয়ে উঠত :

'মর, মর, ভুঁড়িদাস হাঁদা! কাণ্ড দ্যাখ না! ঠিক সোমিয়োনভের মতো! ভোঁদা, হতচ্ছাড়া, বে-আক্কেলে!'

'তোমার কি মনে হয়, মনিব বে-আক্কেলে?'

অবাক হবার ভঙ্গিতে কাঁধদুটোকে উঁচু করত সে; কানদুটোও স্থির থাকত না, খাড়া হয়ে উঠত।

'নিশ্চয়ই মনে হয়।'

'কেন?'

'লোকটা তো বেআক্কেলেই—তাই মনে হয়।'

'তা বলছি না। কেন? কেন বেআক্কেলে মনে হয়?'

এ প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে সে রেগে উঠত :

'কেন! কেন! কারণ লোকটা হচ্ছে একটা বোকা···সব দিক থেকেই হাঁদা!'

কিন্তু একদিন সে আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে। বলতে বলতে তার গলার স্বরে প্রায় একটা ঘৃণার ভাব এসে গিয়েছিল।

'ভাবছ সে আমার সঙ্গে থাকে? থেকেছিল মাত্র দু-বার। আমি যখন সেই বড়ো বাড়িটায় ছিলাম সে সময়ে। কিন্তু এখানে আসার পর থেকে একেবারেই নয়। আমি তার কোলের ওপরে গিয়ে বসতাম পর্যন্ত। আমাকে একটু সুড়সুড়ি দিয়েই সে হেঁকে উঠত—বাস, যাও এবার! সে থাকে অন্য দুজনের সঙ্গে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি ঠিক বুঝতে পারি না, সে আমাকে নিয়ে কি করতে চায়? এই দোকানের লাভ বলতে কিছু নেই। আর জিনিসপত্র বিক্রি করার ব্যাপারে আমি তো একেবারেই আনাড়ি।

কাজটা আমার ভালো লাগে না। তাহলে মতলবটা কী? তাকে জিজ্ঞেস করলে সে ফোঁস করে ওঠে—সে খবরে তোমার কী দরকার? সব দিক থেকে এমন বোকা আর কখনো দেখেছ…'

মাথা নেড়ে সে চোখ বোজে। মুখটা মড়ার মতো ভাবলেশহীন দেখায়।

'অন্য দুজনকে তুমি চেন?'

'চিনি বৈকি। যখন সে মদ গিলতে বসে তখন ওদের মধ্যে একটাকে ধরে নিয়ে আসে আমার কাছে। আর পাগলের মতো চিৎকার করে: দাও তো চাঁদপানা মুখটায় একটা ঘুষি লাগিয়ে! ছুকরীটার গায়ে আমি হাত তুলি না। ওকে দেখে আমার মায়া হয়—এমন থর থর করে কাঁপতে থাকে মেয়েটা! কিন্তু অন্যটাকে, অর্থাৎ ধাড়ীটাকে একবার আচ্ছা করে দিয়েছিলাম। আমি নিজেও মাতাল হয়েছিলাম, সেই অবস্থায় ওকে মেরে বসি। ওকে আমি একেবারেই পছন্দ করি না। তারপর আমার এত খারাপ লাগে যে মনিবের গালেই আঁচড়ে দিয়েছিলাম…'

কথা বলতে বলতে সে নিজের চিন্তার মধ্যেই ডুবে যায়, শরীরটা টান হয়ে ওঠে, তারপর শান্ত স্বরে বলে:

'লোকটার জন্যে আমার দুঃখু হয় ভেব না। ওটা একটা জানোয়ার। কিন্তু কি জান…ওর টাকাপয়সা আছে…এর চেয়ে ও যদি ভিখিরি হত বা রুগী হত তাহলে ভালো হত। আমি তো বলি…কেন তুমি এভাবে বোকার মতো জীবনটাকে নষ্ট করছ? সৎভাবে যাতে জীবনটাকে কাটাতে পার, সে চেষ্টাও তো করা উচিত!…আচ্ছা, দেখেশুনে ভালো একটি মেয়েকে বিয়ে করলেই পার, তারপর ছেলেপিলে হোক…'

'কিন্তু মনিবের তো বিয়ে হয়ে গেছে…'

কাঁধঝাঁকুনি দিয়ে সোফিয়া বলে: 'শোননি, ও একজনকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছিল…নিজের বৌকে ও বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে পারে… বুড়িটা কোনো কাজেরই নয়! আর লোকটা হচ্ছে পাগল…কোনো কিছু ও চায় না…'

আমি তাকে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করি যে কোনো লোককে বিষ খাইয়ে

মেরে ফেলাটা উচিত কাজ নয়। কিন্তু শান্ত স্বরে সে শুধু বলে: 'তবুও তো আকছার ঘটছে…'

তার জানলার আলূসের উপরে একটা সুগন্ধী ফুল ফুটেছিল। একদিন সে আমাকে গর্বের সঙ্গে বলল:

'ভারী চমৎকার সূর্যমুখী ফুল—না?'

'মন্দ নয়। তবে এটা সূর্যমুখী ফুল নয়—এমনি একটা ফুল।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সে আপত্তি জানাল:

'না, কথটা মনে লাগছে না। কাপড়ের ওপরে যেসব ফুল ছাপা থাকে সেগুলো হচ্ছে এমনি ফুল। কিন্তু সূর্যমুখী ফুল হচ্ছে ভগবানের ফুল, সূর্যের ফুল। ফুল বলতে সবই সূর্যমুখী ফুল, তবে আলাদা আলাদা রঙ, এই যেমন আর কি লাল, নীল, পাটল…'

…এই লোকগুলি এমনিতে সাধাসিধে, আসলে কিন্তু বড়ো অদ্ভুত আর সমস্ত ব্যাপারকে এরা বড়ো বিশ্রী রকম গুলিয়ে ফেলে। এদের সঙ্গে চলাফেরা করাটা আমার পক্ষে ক্রমেই আরও বেশি কষ্টকর হয়ে উঠছে। বাস্তব অবস্থাটাই হয়ে উঠেছে ভয়ংকর একটা স্বপ্নের মতো, একটা দুঃস্বপ্ন যেন। আর বইয়ে যে সব কথা লেখা আছে তা যেন ক্রমেই আরো বেশি উজ্জ্বলভাবে এবং আরো বেশি সুন্দরভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে এবং শীতকালের তারার মতো ক্রমেই দূরে সরে সরে যাচ্ছে।

একদিন মনিব তার সবুজ চোখটা দিয়ে সরাসরি তাকাল আমার মুখের দিকে। এইদিন তার চোখটায় যেন দ্যুতি নেই, তামার সঙ্গে অকসিজেনের ক্রিয়ায় যেমন সবুজ ছোপ পড়ে, অনেকটা তেমনি। গোমড়া মুখে আমাকে জিজ্ঞেস করল:

'কি হে, শাখা দোকানে গিয়ে খুব চা-টা খাওয়া হচ্ছে শুনছি?'

'তা হচ্ছে।'

'ভালো, ভালো, তবে একটু সামলে চলতে চেষ্টা কোরো হে…'

আমার পাশেই বসল সে। বসতে গিয়ে প্রচণ্ডভাবে গুঁতো দিল আমাকে। এমন ভাবে কথা বলতে লাগল যেন কোথাও কিছু একটা ছিঁড়ে গেছে। বেড়ালের পিঠে হাত বুলোলে বেড়াল যেমন চোখ পিটপিট করে তেমনিভাবে পিটপিট করছে তার চোখদুটোও। কথা বলতে গিয়ে প্রত্যেকটি কথার স্বাদ নিয়ে নিয়ে ঠোঁট চাটছে।

'ছুঁড়ীটা দেখতে শুনতে ভালোই—না কি বলো হে!...এই তোমাকে বলে রাখলাম...ধন্ম জ্ঞানটুকু ও একেবারে জলাঞ্জলি দিয়ে বসেনি!...আমাকে যে-সব কথা বলে...গির্জার পুরুতরাও আমাকে তা বলতে সাহস করবে না! হুঁ, হুঁ, বাবা! আমি তো পিছনে লাগি—দেখাই যাক না, মাগীর কথা-গুলো মনের কথা কিনা। বলি, শুনে রাখ রে বোকচণ্ডী, এমন মার দেব তোকে, আর লাথি মেরে বার করে দেব!...কিন্তু ও মাগীর ভ্রূক্ষেপও নেই... তবুও সত্যি কথা ফলাতে আসে আমার কাছে, হারামজাদী...'

'সত্যি শুনে আপনি আর কি করবেন?'

'সত্যকে বাদ দিলে অশেষ দুর্গতি।' আশ্চর্যরকম সহজভাবে সে বলে।

তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তীব্র ও ঝাঁঝালো একটা চাউনি দিয়ে আমাকে বিদ্ধ করে। এমন একটা বদমেজাজের সঙ্গে কথা বলতে থাকে যেন আমি তার কাছে কিছু একটা দোষ করে ফেলেছি।

'তুমি কি মনে করো, জীবনটা হচ্ছে শুধু একটা ফুর্তির ব্যাপার?...'

'তা তো মনে হয় না, বিশেষ করে আপনাকে দেখে...'

'আপনাকে দেখে!' কথার মধ্যেই সে ভেংচি কেটে ওঠে, তারপর বহুক্ষণ আর কোনো কথা বলে না। মুখটা নীল হয়ে গেছে, চোয়ালটা ঝুলে পড়েছে যেমনভাবে গরমের দিনে বাড়ির অনেক দিনের পোষা কুকুরের চোয়াল ঝুলে পড়ে, নেতিয়ে পড়েছে কানদুটো, নিচের ঠোঁটটা ঝুলঝুল করছে ঠিক একটুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো। তার দাঁত থেকে আগুনের লালচে আভার ঝলক ঠিকরে আসছে।

'জীবনটা ফুর্তির ব্যাপার শুধু বোকাদের কাছে...চালাক লোকেরা... চালাক লোকরা ভদ্‌কা গেলে, হৈচৈ করে...এই জীবনটার

সঙ্গেই বিবাদ বাধিয়ে বসে···এই আমার কথাই ধরো না কেন···মাঝে মাঝে তো আমি সারারাত চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকি—তেমনি ভাবেই কাটিয়ে দিই রাতটা, কিন্তু কই, দেখি না তো কোনো ব্যাটা উকুন পর্যন্ত আমাকে কামড়াতে আসে! যখন আমি মজুরগিরি করতাম তখন উকুনগুলোও আমাকে পছন্দ করত···এটা হচ্ছে টাকাপয়সা হওয়ার লক্ষণ···এমনটিই হয়ে থাকে·· যেই আমার নিজের জীবনটা পরিপাটি হয়ে ওঠে অমনি উকুনগুলোও খসে খসে পড়ে···সবকিছুই খসে পড়ছে! পড়ে আছে শুধু কতকগুলো শস্তা জিনিস—মেয়েলোক···সবচেয়ে ঝঞ্ঝাটের, সবচেয়ে কষ্টের...'

'আপনি কি এই জায়গাতেই সত্যকে খুঁজছেন নাকি?'

রেগে গিয়ে মনিব বলে:

'ভাব কি তুমি? তোমার কদর থাকতে পারে আর ওদের কদর নেই? আর ওই মানুষগুলো? আচ্ছা, কুজিনকেই দ্যাখ না কেন! লোকটা ধম্মভীরু, যা সত্যি বলে জানে তা বলতে আসে···ভাবে খবরগুলোর বদলে আমি ওকে টাকা দেব। এই তোমাকে বলছি শুনে রাখ, আমি কারও পরোয়া করিনে, বাজে জিনিস চোখে পড়লে আমি নিজেই ধুলিসাৎ করে দেব!'

দু আঙুলের একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে আগুনের দিকে বাড়িয়ে ধরে।

'ইয়েগরটার পেটে পেটে শয়তানি। আর প্যাঁচার মতো নিরেট। তুমিও কম যাও না, সব সময়েই গাল ফুলিয়ে হাঁক ছাড়ছ। আর ফিকিরে ফিকিরে আছ, সুযোগ পেলেই কোনো একটা মানুষের ঘাড়ে চেপে বসবে। তুমি চাও তোমার কথামতো সবাই চলুক। কিন্তু আমি তাতে রাজি নই। ভগবানের হাত থেকেই রেহাই পেয়ে গেছি আমি: যাও বাপু সেমিয়োনভ খুশিমতো চরে বেড়াও গিয়ে. তোমার ব্যাপারে আমি হাত দিতে চাই না—নরকে যাও, উচ্ছন্নে যাও, যেখানে খুশি যাও, আমার কিছু যাবে আসবে না।'

তার লালচে মুখটার ওপরে আগুনের আভা এসে পড়েছে, চকচক করছে মুখটা, বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে আছে মুখের ওপরে। অনড় চোখ, জড়ানো কথা।

'কিন্তু সভ্কা আমার মুখের ওপরেই বলে দেয়—তুমি খারাপ জীবন কাটাচ্ছ! খারাপ? খারাপ বৈকি—তুমি তো আর শুয়োর কিংবা নেকড়ে নও···

মানুষের জীবনটা কেমন হবে শুনি? ও বলে, তা আমি জানি না, সেটা তোমাকেই ভেবেচিন্তে নিতে হবে! এদিক থেকে তুমি কিন্তু রীতিমতো চালাক, কিছুতেই স্বীকার করবে না যে, তুমি জান না—এই হচ্ছে তোমার সম্পর্কে খাঁটি কথা। এটা বাঁচার রাস্তা নয়, বাঁচার রাস্তা কী, তাও আমি জানি না—সাফ কথা! আর তুমি কিনা, তুমি কিনা…'

বলতে বলতে সে একটা কুৎসিত গালাগালি দিয়ে ওঠে, এবং আরো উত্তেজিত হয়ে বলে চলে:

'আমি ওকে বলি সোভা*। দিনের বেলায় ও আস্ত একটা বোকা, কোনো দিকে এতটুকু ঠাহর করতে পারে না। অবিশ্যি রাত্রিবেলাও বোকাই থাকে—তবে রাত্রিবেলা অন্তত এইটুকু হয় যে…যাকে বলে সাহস বেড়ে যাওয়া—'

জিভ দিয়ে আলতোভাবে চু-চু শব্দ করে। শব্দটা শুনে আমার মনে হয়, তার গলার স্বরে খানিকটা আদর করার সুর এসে গেছে। আরেক দিন শুয়োরগুলোর সঙ্গে কথা বলবার সময়ে যখন বলেছিল, আয় রে আয়, আয় রে আমার পুষির দল—তখনো এমনি সুরই শোনা গিয়েছিল।

সে বলে চলে:

'তিনটে মেয়েলোককে আমি রেখেছি। একজন হচ্ছে শরীরের আনন্দ দেবার জন্যে—কোঁকড়া-চুল নাদিয়া। একেবারে পুরোদস্তুর বাজারের মেয়েলোক! দেখে মনে হবে, সব কিছুতেই তার ভয়। আসলে কিন্তু কোনো কিছুকেই সে ভয় করে না। মেয়েটার না আছে ভয়, না আছে বিবেক—শুধু আছে লোভ। রক্তচোষা জোঁক একেবারে। মুনি-ঋষিকেও ঘোল খাইয়ে দেবে। আরেকজন হচ্ছে কুরোচকিনা—মনের আনন্দ দেবার জন্যে। ওর নাম হচ্ছে গ্লাশা, গ্লাফিরা—কিন্তু কুরোচকিনা ছাড়া অন্য কোনো নামে ওকে ডাকাই চলে না।…এইটুকুই আছে মেয়েটার মধ্যে! ওকে ক্ষেপাতে আমার খুব ভালো লাগে। আমি বলি, যতোই ভগবানের নাম করো না কেন, যতোই ঠাকুরের সামনে বাতি জ্বালাও না কেন, নরকের

* রুশ ভাষায় 'সোভা' শব্দটির অর্থ পেঁচা।

শয়তানরা তোমার জন্যে ঠিকই অপেক্ষা করে আছে! নরকের শয়তানদের ওর ভীষণ ভয়, নাম শুনেই আড়ষ্ট হয়ে থাকে। ওদিকে অচল টাকাপয়সা চালাতে খুবই ওস্তাদ। এই তো সেদিনই আমার কাছে একটা অচল চালিয়ে দিয়েছিল। তিন রুবল। তার আগে চালিয়েছিল পাঁচ রুবল! এত অচল ওর কাছে আসে কোথেকে? বলে, খদ্দেররা নাকি ওকে দিয়ে যায়। এসব ওর বানানো কথা। নিশ্চয়ই কোনো একটা দলের সঙ্গে জুটেছে। অচল চালাতে পারলেই সম্ভবত ও দালালি পায়। পেটে পেটে শয়তানি! এমনিতে ওর সঙ্গে সময় কাটাতে ভালো লাগে না... কিন্তু একবার যদি ওকে তাতিয়ে তুলতে পার তাহলে আর দেখতে হবে না··· তখন সে এমন চাঙ্গা হয়ে ওঠে যে আমার পর্যন্ত শরীরের মধ্যে শিরশিরানি ধরে যায়।···যে কোনো লোককে ও নাজেহাল করতে পারে। একটা বালিশ দিয়েই দম আটকে মেরে ফেলতে পারে যে কোনো লোককে। হ্যাঁ, শুধু একটা বালিশ—আর কিচ্ছু লাগবে না! তারপর কাজটা শেষ হয়ে গেলে সে প্রার্থনা করতে বসবে: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে কৃপা করো! ঠিক এমনটিই ঘটবে!'

লকলক করছে আগুনের শিখা। ক্রমেই বেশি বেশি গরম হচ্ছে, ক্রমেই বেশি বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। তার কুৎসিত মুখটা আগুনের আভায় টকটকে। কিন্তু সেই মুখটার মধ্যে কোথাও এমন কিছু আছে যা দেখলে গায়ে ভীষণ জ্বালা ধরে যায়। শরীরটাকে দুমড়ে মুচড়ে সে আগুনের আঁচ থেকে সরে যাচ্ছে; ঘামছে দর দর করে; চটচটে একটা দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসছে তার গা থেকে—গরমকালে আস্তাকুঁড় থেকে যেমন গন্ধ বেরোয়, তেমনি। ভয়ানক একটা ইচ্ছে জাগে, লোকটাকে জবরদস্ত রকমের ধমক দেওয়া যাক, কষে দু-এক ঘা লাগিয়ে দেওয়া যাক, এমনভাবে ক্ষেপিয়ে তোলা যাক যাতে সে অন্যভাবে কথা বলে। ওদিকে আবার না শুনেও পারা যায় না। এই সমস্ত গালগল্প ও কুৎসিত আলাপ ভয়ানক একটা কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। কথাবার্তা থেকে যতোই পচা দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসুক না কেন, রীতিমতো একটা আগ্রহ ও উৎকণ্ঠাও সৃষ্টি করে···

'ওরা সবাই মিথ্যে কথা বলে—যারা বোকা তারা মিথ্যে বলে নিজেদের বুদ্ধিহীনতার জন্যে, যারা চালাক তারা মিথ্যে বলে নিজেদের অতি-চালাকির জন্যে। শুধু সত্যি কথা বলে সভকা···সত্যি সত্যিই বলে···আর সত্যি কথা সে বলে নিজের মঙ্গলের জন্যে নয়, নিজের আত্মার কথা ভেবে নয়—ওসব আত্মা-ফাত্মার কথা ভেবে কি লাভ! সে সত্যি কথা বলে শুধু এই কারণেই যে সে সত্যি কথা বলতে চায়। শুনেছিলাম ছাত্রদের মধ্যে নাকি সত্যের জন্যে ভয়ানক একটা আগ্রহ আছে। ব্যাপারটা সত্যি কিনা দেখবার জন্যে আমি পানশালায় ঘোরাঘুরি করেছি···এই পানশালাগুলোতেই তো ছাত্ররা দঙ্গল বেধে আসে···কিন্তু সমস্ত ভুয়ো কথা···সে ধরনের ব্যাপারই নয়···দেখলাম গিয়ে একদল মাতাল—হ্যাঁ, পুরোপুরি মাতাল···'

আপন মনেই সে বিড়বিড় করে চলে। আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও নেই, আমি যে তার পাশে বসে আছি সে খেয়ালটুকু নেই পর্যন্ত।

মনিবকে দেখে এখন কিছুতেই বলা যাবে না, সে মাতাল হয়ে আছে না স্বাভাবিক অবস্থায়। নাকি কোনোটাই নয়—মনিব অসুস্থ? তার ঠোঁট আর জিভ যেন অতি কষ্টে নড়ছে; মনে হয়, তার মনের মধ্যে কতগুলি নিষ্ঠুর কথা দানা বাঁধতে চেষ্টা করছে আর সেই কথাগুলিকে স্পষ্টভাবে বার করে নিয়ে আসবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে তার ঠোঁট আর জিভ। ঠিক এই মুহূর্তে লোকটিকে কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না যেন। তার ঘড়ঘড়ে গলায় স্বরে কিছুমাত্র কান না দিয়ে আমি ঘুম-জড়ানো শরীরে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি আগুনের দিকে।

কাঠগুলো ভিজে; সশব্দে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। হিসিয়ে উঠছে, থুৎকারে ফেটে পড়ছে. গাঢ় নীল রঙের ধোঁয়া উগ্‌রোচ্ছে। ঘুঁটিগুলোকে জড়িয়ে জড়িয়ে লাল অগুনের শিখার হিল্লোল, লক লক করে ফুঁশে উঠছে, সাপের মতো জিভ বার করে নিচু খিলানের ইটগুলোকে লেহন করছে, দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে দলা পাকিয়ে ছুটে আসছে চুল্লির খোলা মুখের দিকে; তাদের বাধা দিচ্ছে ধোঁয়া—গাঢ় পুরু ধোঁয়া।

'বকবক মহারাজ!'

'আজ্ঞে ?'

'তোমার মধ্যে কী দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম জান ?'

'সেকথা আপনি আমাকে বলেছেন।'

'তা বটে…'

আবার সে চুপ করে যায়। তারপর ঠিক একটা ভিখিরির মতো ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে থাকে :

'আমার ঠাণ্ডাই লাগুক, আমি মরেই যাই বা বেঁচেই থাকি—তা নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন হয়েছিল শুনি! মুখে তুমি তাই বলেছিলে… নিশ্চয়ই কিছু ভেবে বলোনি, ওটা ছিল নেহাতই কথার কথা—কি বলো!'

'আপনি এবার বরং ঘুমোতে যান…'

সে খিক্‌-খিক্ করে হেসে ওঠে, মাথা ঝাঁকায়. তারপর তেমনি খুঁতখুঁতে স্বরে বলে :

'ভালো কথা বলতে গেলাম কিনা তাই আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইছ…'

মনিবের কথার মধ্যে এমন ভালোমানুষির পরিচয় এর আগে আমি আর কখনো পাইনি—এই প্রথম। কথাগুলোর মধ্যে কতটা আন্তরিকতা আছে তা যাচাই করে দেখবার ইচ্ছে হল। আমতা আমতা করে বললাম :

'বাচ্চা ইয়াশার কথাটাও একবার বলুন—ইয়াশা যেন ভালো হয়ে ওঠে।'

কথাটা শুনে কাঁধের একটা ভঙ্গি করে মনিব চুপ করে থাকে।

মনিবের সঙ্গে এই কথাবার্তা যেদিন হয়েছিল তার দিন দুয়েক আগে 'ঝুমঝুম' হঠাৎ এসে হাজির হয়েছে কারখানায়। মাথার চুল পরিপাটি করে ছাঁটা, ফিটফাট চেহারা, শরীরটা যেন তার চোখের মতোই আগাগোড়া স্বচ্ছ। আর হাসপাতাল থেকে এসে চোখদুটো হয়ে উঠেছে আরো টলটলে। ফুটফুট দাগওলা ছোট্ট মুখখানা আরো রোগাটে হয়ে গেছে, নাকটা বেঁকে গিয়ে উঠেছে আরো উঁচুদিকে। মুখের ওপরে স্বপ্নাচ্ছন্ন হাসি, কারখানা-ঘরের মধ্যে চলাফেরা করেছে অদ্ভুতভাবে পা ফেলে ফেলে—যেন এক্ষুনি সে একলাফে মাটি ছাড়িয়ে আকাশে উঠে যাবে। প্রতি মুহূর্তে ভয়, এই বুঝি পরনের শার্টটা নোংরা হয়ে গেল; আর হাবভাব দেখে মনে হয়, নিজের পরিষ্কার

হাতদুটো নিয়ে কি যে করবে ভেবেই পাচ্ছে না। কড়া ইস্ত্রি-করা পাৎলুনের পকেটে লুকিয়ে রেখেছে হাতদুটো। পাৎলুনটাও একেবারে নতুন।

কারখানার লোকরা জিজ্ঞেস করে, 'তোমাকে এমন সাজগোজ করিয়ে দিলে কে?'

'জুলিয়াদিদি।' সরু চাপা গলায় সে জবাব দেয়। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বাঁ হাতটা শূন্যে বাড়িয়ে দিয়ে বলতে থাকে:

'তিনি হচ্ছেন মেয়ে ডাক্তার। একজন কর্নেলের মেয়ে। তুর্কীরা কর্নেলের পা কেটে দিয়েছে—একেবারে হাঁটু থেকে কেটে দিয়েছে। কর্নেলকেও আমি দেখেছি। এক্কেবারে টাক-মাথা। আর অনবরত শুধু বলেন—ও কিচ্ছু না, ও কিচ্ছু না...'

'ওরে দেখছিস তো, হাসপাতালটা তো বেড়ে জায়গা! কথাবার্তা পর্যন্ত ভদ্দরলোকের মতো হয়ে যায়!'

'তোমার ডান হাতে কী?'

'কিছু না।' আশঙ্কায় চোখ বড়ো বড়ো করে সে পাল্টা জবাব দেয়।

'মিথ্যুক! দেখি হাতখানা!'

ছেলেটি ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। শরীরটা টান হয়ে ওঠে, হাতটা ঢুকিয়ে দেয় পকেটের আরো ভিতরের দিকে। ব্যাপার দেখে অন্যদের কৌতূহল জাগে, তারা ঠিক করে যে ছেলেটির পকেট হাতড়ে দেখবে। সবাই মিলে ছেলেটিকে চেপে ধরে এবং কিছুক্ষণ টানাহেঁচড়ার পরে তার পকেট থেকে টেনে বার করে একটা চকচকে কুড়ি-কোপেক মুদ্রা আর এনামেল করা ছোট্ট একটা মূর্তি—মেরীমাতা ও শিশু। কুড়ি-কোপেক মুদ্রাটি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু মূর্তিটা হাতে হাতে ঘুরতে থাকে। প্রথম দিকে ছেলেটি উদগ্রীব হয়ে মূর্তিটা ফেরত পাবার জন্যে হাত বাড়িয়ে ছিল, শেষকালে বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। ভূতপূর্ব সৈনিক মিলোভ যখন তাকে মূর্তিটা ফিরিয়ে দেয়, তখন আর তার কোনো উৎসাহ নেই, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মূর্তিটা পকেটে পুরে স্থানত্যাগ করে। রাত্রিবেলা খাওয়াদাওয়ার পরে সে আসে আমার কাছে। মুষড়ে-পরা ক্লিষ্ট চেহারা, সারা গায়ে আর মুখে ময়দার লেই ও

গুঁড়ো লেগে আছে, আগেকার সেই উৎসাহ-উদ্দীপনার কিছুই অবশিষ্ট নেই।

'কই, কি উপহার পেয়েছ, আমাকে তো দেখালে না?'

নীল চোখ তুলে ছেলেটি দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'নেই···'

'কোথায় গেল?'

'হারিয়ে গেছে···'

'বলছ কি তুমি?

ইয়াশ্‌কা জোরে শ্বাস টানে।

'কি করে হারালে?'

'ফেলে দিয়েছি।' চাপা স্বরে সে বলে।

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমি তাকিয়ে আছি দেখে বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন এঁকে আবার বলে :

'মাথার ওপরে ভগবান আছেন! তোমার কাছে মিথ্যে বলব না। আমি থেটাকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়েছি। তখন থেটা ঠিক আলকাতরার মতো ফুটতে থুরু করে। তারপর পুড়ে ছাই হয়ে যায়।'

ছেলেটি হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, তারপর আমার কোলে মুখ গুঁজে কান্নার ফাঁকে ফাঁকে ভাঙা ভাঙা স্বরে বলে :

'নোংরা ভূত···যা পায় তাই হাতের মুঠোয় নেওয়া চাই···পন্টনীটা হাত দিয়ে মূর্তিটাকে ধরেছিল···কোণা থেকে চল্‌টা উঠিয়ে দিয়েছে···থয়তান···হাত দিলে জিনিথ ফেলে দিতে হয়···জুলিয়াদিদি দিয়েছিল আমাকে···দেবার সময়ে মূর্তিটাকে চুমু খেয়েছিল···আমাকেও চুমু খেয়েছিল—বলেছিল, এই নাও খোকামণি, এটা তোমাকে দিলাম!···রেখে···দিও···তোমার···ভালো···হবে···'

রোগা শরীরটা কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে। বেশ কিছুক্ষণ আমিও ওকে শান্ত করতে পারি না। কারথানার অন্য লোকরা এসে ওকে এভাবে কাঁদতে দেখুক, আর কেন ও কাঁদছে তার বেদনাদায়ক তাৎপর্যটুকু বুঝুক তা আমি চাই না···

মনিব হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসে, 'ইয়াশ্কার কী হয়েছে?'

'ওর শরীরটা খুব দুর্বল। কারখানার কাজ করবার ক্ষমতা ওর আর নেই। আপনি বরং ওকে কোনো একটা দোকানে ছোকরার কাজে লাগিয়ে দিন।'

মনিব চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ওঠে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়ায়, তারপর অস্থির-ভাবে বলে:

'ও যদি দুর্বলই হয় তাহলে দোকানের কাজই বা করবে কি করে! ভীষণ শীত ওখানে—সহজেই ওর ঠাণ্ডা লেগে যাবে। তাছাড়া গারাশ্কা আছে—সে ওকে ছেড়ে কথা বলবে না। তার চেয়ে বরং ওকে সভ্কার দোকানে পাঠিয়ে দাও…সে নিজেও নোংরা, জায়গাটাও ধুলো আর নোংরায় ভর্তি। ও বরং ওখানে গিয়ে যা পারে করুক…খুব পরিশ্রমের কাজ কিছু নেই…'

চুল্লির মধ্যে জ্বলন্ত অঙ্গারের সোনালী স্তূপের দিকে তাকিয়ে মনিব হঠাৎ হাঁসফাঁস করে ওপরে উঠে আসে।

'কয়লা খুঁচিয়ে দাও হে—সময় হয়েছে!'

চুল্লির মধ্যে আমি লম্বা খোঁচানীটা ঢুকিয়ে দিই। আর শুনতে পাই, মাথার ওপর থেকে মনিব কথা বলছে; আলস্যের সঙ্গে চিবিয়ে চিবিয়ে বলা কতকগুলো শব্দ:

'তুমি একটি আস্ত হাঁদারাম!…হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছ…অদ্ভুত লোক তুমি…দূর…দূর…'

মার্চমাসের সূর্য উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। অনেক সতর্কভাবে, অনেক বাঁচিয়ে সূর্যের আলো ঢুকছে পুরনো ভাঙা বাড়িগুলোর ঘন ছায়ায় ঢাকা ঘিঞ্জি রাস্তায়। শহরের মাঝখানটিতে গুমোট কুঠরির মধ্যে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমরা বন্দী থাকি। আমরাও টের পাই, বসন্ত আসছে—টের পাই যখন দিনের পর দিন কুঠরির ভিতরটা আরো অনেক বেশি স্যাঁৎসেঁতে হয়ে ওঠে।

দুপুরের পরে কারখানার একেবারে শেষ জানলাটির ভিতর দিয়ে একফালি

রোদ মিনিট কুড়ি সময়ের জন্যে কারখানার মধ্যে ঢুকে পড়ে। বয়সের ছাপ পড়ে পড়ে জানলার কাচগুলো এমনিতেই রামধনুর মতো বিচিত্র—রোদ লেগে তা উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়ে ওঠে। বাতাস চলাচলের ছোট্ট ফাঁকটুকু দিয়ে শোনা যায়, রাস্তার অনাবৃত পাথরের ওপরে স্লেজ ছোটার কিঁচ-কিঁচ শব্দ। রাস্তার বিচিত্র শব্দকে মনে হতে থাকে বাধামুক্ত আর আগের চেয়েও তীক্ষ্ণ।

বিস্কুটের কারখানায় গানের আর বিরাম নেই। কারখানা-ঘরটা গম গম করে। কিন্তু শীতকালের গানের মধ্যে যেমন একটা ঐকতান ছিল, তা যেন এখন আর নেই। যৌথ-সঙ্গীত তেমন আর জমে না। যারা গান গাইতে জানে, তারা একা-একাই গান গায়, আর গাইতে গাইতে প্রায়ই গানের সুর বদলে ফেলে। মনে হয়, এমন কোনো গান তারা খুঁজে পাচ্ছে না যা সেই বসন্ত-দিনে নিজেদের আত্মার সুরে সুর মেলাতে পারে।

ফেলে চলে গেছ মোরে হে মোর হৃদয়!

চুল্লির পাশে দাঁড়িয়ে জিপ্‌সি গান গায়। ভানোকের কষ্ট হচ্ছে, তবুও সে জোর করে আগে আগে গেয়ে চলে:

জীবনের ভগ্নশেষ রয়েছে সুমুখে···

আচমকা সে থেমে যায়, তারপর ঠিক যেমনি চড়া গলায় গান গাইছিল, তেমনি চড়া গলায় বলে ওঠে:

'আর মাত্র দশটা দিন বাকি, তারপরেই আমাদের গাঁয়ে চাষের কাজ শুরু হয়ে যাবে গো!'

শাতুনভ সবেমাত্র ময়দা-ঠাসার কাজ শেষ করেছে। পরনে জামা নেই, ঘামে চকচক করছে সারা গা। জানলার দিকে অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে এতক্ষণ গাছের বাকলের ফিতে দিয়ে মাথার চুল বাঁধছিল।

এবার তার গুরুগম্ভীর গলার স্বর হালকা মূর্ছনায় বেজে ওঠে:

চলেছে পথে পথে তীর্থযাত্রী
বাক্যহারা সবে নির্বাক যাত্রী।

আর্তেম এক কোণে বসে বসে কতগুলি ছেঁড়া চটের থলে সেলাই করছে। আর মেয়েলি গলায় গান গাইছে গুন গুন করে। সুরিকভের

কয়েকটি কবিতা তার মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল, তাই সে গাইছে। গাইতে গাইতে কেশে উঠছে মাঝে মাঝে।

কাষ্ঠ শবাধারে শায়িত তুমি হে
ওগো পরান-বন্ধু অন্তরতম···
শ্বেত বস্ত্রাবৃত আপাদচিবুক
পাণ্ডু, কৃশতনু, ক্ষয়িতক্ষম···

তার দিকে তাকিয়ে থুতু ফেলে কুজিন বলে ওঠে, 'কাণ্ড ছাখনা! গানের কি ছিরি—আহা! বেকুব গর্দব যতো···ওরে এই ক্ষুদে শয়তানরা, তোদের হাজার বার বলেছি না···'

জিপ্‌সি হঠাৎ গান থামিয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'যীশুর নামে বলছি, দেখে নিও, পৃথিবীতে শিগগিরই অবাক-করা দিন আসছে!'

তারপরে ক্ষিপ্র পায়ে তাল দিতে দিতে তারস্বরে চেঁচাতে থাকে:

এসেছে এসেছে দামাল মেয়েটি
দুর হতে শুনি মধুর হাসিটি
চিত্ত আমার তৃষিত যার লাগি
সেই সোনামণি নয়নের নিধি।

উলানভ গেয়ে চলে:

আমাদের খুদে অ্যান সদা হাসিমুখ
সারা বাড়ি তোলপাড় সবে অনুগত
এপ্রিল এলে পরে চলে মাতামাতি।···

কোনো গানের সঙ্গে কোন গানের মিল নেই, কথাবার্তা টুক্‌রো-টাক্‌রা—তবুও সব কিছুর মধ্যে টের পাওয়া যায় বসন্তের দৃপ্ত আগমনী, নব-জাগরণের অনুরণিত আশা। এই নানা-ধারায় মেশানো জটিল সুর অবিশ্রান্ত বয়ে চলেছে। মনে হয়, লোকগুলি যেন এক নতুন ধরনের সমবেত গীত শিখছে। এই বিচিত্র শব্দতরঙ্গ উত্তাল ঢেউ তুলে তুলে আছড়ে পড়ছে রুটির কারখানার মধ্যে, আমি যেখানে কাজ করি—সেখানে। শব্দগুলি

একেবারেই আলাদা আলাদা কিন্তু তবুও একটা মিল আছে। শব্দগুলির মধ্যে যে মাধুর্য আছে তা একই ধরনের উন্মাদনা সৃষ্টি করে।

আমিও ভাবছি বসন্তের কথা। বসন্তকে কল্পনা করি এক নারীর মূর্তিতে; সেই নারী পৃথিবীর সমস্ত কিছুকে ভালোবাসে, তার ভালোবাসায় এতটুকু মলিনতা নেই। চিৎকার করে পাশ্‌কাকে বলি :

আমাদের খুদে অ্যান সদা হাসি মুখ
সারা বাড়ি তোলপাড় সবে অনুগত···

রামধনু-রঙা জানলার দিকে শাতুনভ তাকিয়েছিল। চওড়া মুখটা ফিরিয়ে দেখে। পরক্ষণেই জিপ্‌সির জবাবকে চাপা দিয়ে গম-গম করে ওঠে তার গলার স্বর :

দুর্গম পথ যন্ত্রণা ভরা
পাপীদের তরে নহে তাহা···

মনিবের কামরার পাতলা দেওয়ালের একটা ফাটল দিয়ে শোনা যাচ্ছে মনিবের বুড়ী উপপত্নীর একঘেয়ে প্যানপ্যানানি :

'ভাসিলি গো···ভাসিলি আমার···'

সপ্তাহখানেকের ওপর হল মনিব প্রচণ্ডভাবে মদ গিলে চলেছে। এই মত্ত অবস্থার ঘোর কাটবার কোনো লক্ষণই এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। মাতাল হতে হতে এমন একটা অবস্থায় সে পৌছেচে যে তার আর কথা বলবার ক্ষমতা নেই। মুখ থেকে খালি গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। চোখের উজ্জ্বলতা নেই, আর চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায় যেন। দেখে মনে হয়, চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না; ঠিক অন্ধ মানুষের মতো সোজা ও খাড়া হয়ে হাঁটে। নদী থেকে টেনে তোলা মানুষের মতো তার শরীরটা ফুলে উঠেছে আর ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কানদুটো হয়ে উঠেছে আরো বড়ো আর খাড়া-খাড়া, ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে, বেরিয়ে পড়েছে দাঁতগুলো। মুখটা এমনিতেই হয়ে উঠেছে যথেষ্ট বিকট আর সেই বিকট মুখের মাঝখানে দাঁতগুলো যেন অপ্রয়োজনীয়। মাঝে মাঝে সে বেরিয়ে আসে নিজের ঘর থেকে, ক্ষুদে ক্ষুদে পা ফেলে থপ্‌থপ করে

হাঁটে। পা ফেলে অনাবশ্যক রকমের বেশি জোর দিয়ে দিয়ে, আর চলাফেরার সময়ে সামনাসামনি কেউ এসে গেলে সরাসরি গায়ের ওপরে এসে পড়ে। আর তখন তার অন্ধ চোখের ভয়ঙ্কর দৃষ্টির সামান কুঁকড়ে যেতে হয় যে-কোন লোককে। তার পিছনে পিছনে টলতে টলতে চলে ইয়েগর ; হাতের অতিকায় থাবার মধ্যে মস্ত একটা ভদ্‌কার পাত্র আর একটা গ্লাস। তারও সমান মস্ত অবস্থা, এবড়ো খেবড়ো মুখটায় ফুটে উঠেছে লাল লাল হলদে হলদে ছোপ, নিষ্প্রভ চোখদুটো আধ-বোজা, আগুনে-পোড়া মানুষের খাবি খাওয়ার মতো হাঁ-করা মুখ।

'সরে যাও···মনিব আসছে···'

চলতে চলতে সে বকবক করে ; তার ঠোঁটদুটো নড়ে না।

শেষের দিকে থাকে বুড়ী উপপত্নী। সে চলে মাথাটাকে নিচু করে। চোখদুটো দিয়ে এমনভাবে জল গড়াতে থাকে যে মনে হয়, এই বুঝি তার চোখদুটো গলে গিয়ে হাতের ট্রে-র ওপরে টপ করে ঝরে পড়বে আর ট্রে-র খাবারগুলিতে মাখামাখি হয়ে যাবে। ট্রে-র ওপরে নীল প্লেটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নোন্‌তা মাছ, রসানো ব্যাঙের ছাতা এবং আরো নানা রকমের টুকি-টাকি খাবার।

আর তখন কারখানা-ঘরে নেমে আসে মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা। রুদ্ধশ্বাস রাত্রি যেন। এই তিনটি অস্বাভাবিক লোক নির্বাক ভাবে হেঁটে চলে যায় আর তাদের চলবার পথে একটা উৎকট আর জ্বালা-ধরানো গন্ধ চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে। এই ত্রিমূর্তিকে দেখে ভয় পায় সবাই, হিংসে হয় সবার। এবং এই ত্রিমূর্তি দরজার ভিতর দিয়ে চোখের দেখার বাইরে চলে যাবার পরেও কারখানা-ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যে একটা বুকচাপা নিস্তব্ধতা থমথম করে।

তারপর শোনা যায় চাপা স্বরে বলা দু'একটা সতর্ক মন্তব্য :

'লোকটা মদ খেয়ে খেয়েই মরবে···'

'মরবে বলছ ? ওই লোক ! কক্ষনো না !'

'ভাইরে কত রকমের খাবার নিয়ে চলেছিল দেখেচিস তো !'

'চমৎকার গন্ধ বেরিয়েছিল কিন্তু···'

'উচ্ছন্নে যাচ্ছে লোকটা, উচ্ছন্নে যাচ্ছে…'

'কিন্তু যাই বলো ভাই মদ গিলতে পারে বটে!'

'পুরো একমাসেও তুমি এতটা মদ গিলতে পারবে না!'

'কি করে জানলে?' ভূতপূর্ব সৈনিক মিলোভ বলে; বলার ভঙ্গিটা বিনীত, কিন্তু নিজের শক্তি সম্পর্কে একটা আস্থার সুরও তার মধ্যে আছে—'বেশ তো, একবার যাচাই করেই নাও না! মাসখানেকের মতো মদ খাওয়াও তো দেখি!'

'হ্যাঁ, তাহলেই হয়েচে, গায়ের জড় খসে যাবে …'

'তাহলেও মদ খাবার সময়ে কিছুক্ষণের জন্যে ফুর্তি করা যাবে তো…'

মনিবকে দেখবার জন্যে আমি বারকয়েক গলিতে গিয়েছিলাম। থক-থকে উঠোন; উঠোনের ঠিক মাঝখানটিতে রোদের মধ্যে একটা পুরনো ভাঙা বাক্‌স উলটিয়ে বসিয়েছে ইয়েগর। বাক্‌সটাকে দেখাচ্ছে একটা কফিনের মতো। মনিবের খালি মাথা, বসে আছে বাক্‌সের মাঝখানে; ডান হাতে খাবারসমেত ট্রে, বাঁ হাতে মদের পাত্র, উপপত্নী বসেছে বাক্‌সের এক কোণে, চোরের মতো গুটিয়ে-সুটিয়ে। ইয়েগর দাঁড়িয়ে আছে মনিবের পিছনে, বগলের তলায় মনিবকে চেপে ধরে আছে আর মনিবের শিরদাঁড়াকে ঠেকা দিয়েছে হাঁটু দিয়ে। মনিব নিজের সারা শরীরটাকে পিছনদিকে বেঁকিয়ে দিয়ে কুয়াশা-ম্লান আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

'ইয়েগ…নিশ্বাস ফেলছ তো তুমি?'

'হ্যাঁ…'

'নিশ্বাস হচ্ছে পোভুর মহিমে— নয় কি? ঠিক বলিনি?'

'হ্যাঁ, ঠিক কথা…'

'গেলাস ভর্তি করো…'

স্ত্রীলোকটি ভয়-পাওয়া মুরগির মতো হকচকিয়ে উঠে মনিবের হাতে এক গ্লাস ভদকা বাড়িয়ে দিয়েছে। গ্লাসটা হাতে নিয়ে মনিব মুখের উপরে চেপে ধরে, তারপর ধীরেসুস্থে একটু একটু করে চুমুক দেয়। স্ত্রীলোকটি দ্রুত হাত চালিয়ে ছোট ছোট ক্রুশচিহ্ন আঁকতে থাকে, তারপর ঠোঁটটাকে এমনভাবে

ছুঁচলো করে তোলে যেন সে কাউকে চুমু খেতে চাইছে। দেখে কষ্ট হয় আবার মজাও লাগে।

তারপর শুরু হয় তার নাকিসুরে প্যানপ্যানানি :

'ইয়েগর…লক্ষ্মীটি…ওকে আর খেতে দিও না…ও মরে যাবে…'

'কিচ্ছু ভাবতে হবে না গিন্নীমা…যা করেন ভগবান…ভগবানের ইচ্ছে ছাড়া কিছুই ঘটে না।' ইয়েগরের কথাগুলোকে প্রলাপের মতো শোনায়।

বাইরে বসন্তের উজ্জ্বল রোদ। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে জমে থাকা জল চিকচিক করছে।

আরেক দিনের ঘটনা। আকাশ ও বাড়ির ছাদগুলোকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করে মনিব এমনভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে আসে যে প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ে যাবার মতো অবস্থা। তারপর জিজ্ঞেস করে :

'আজকের দিনটা কার হে ?'

'ভগবানের।' বেশ ভারী সুরে ইয়েগর জবাব দেয়। অতি কষ্টে মনিবকে সে মুখ থুবড়ে পড়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। সেমিয়োনভ তার একটা পা সামনের দিকে বাড়িয়ে আবার জিজ্ঞেস করে :

'এই ঠ্যাঙটা কার ?'

'আপনার।'

'মিথ্যে কথা! আমি কার ?'

'সেমিয়োনভের…'

'মিথ্যে কথা।'

'ভগবানের।'

'তাই তো!'

মনিব পা-টা তোলে, তারপর জলকাদা ভর্তি একটা গর্তের মধ্যে নামিয়ে আনে। কাদা ছিট্‌কিয়ে আসে মনিবের মুখে ও বুকে।

'ইয়েগরি…' বুড়ীর নাকি সুরের প্যানপ্যানানি শুরু হয়ে যায়। আঙুল ঝাঁকিয়ে ইয়েগর বলে :

'গিন্নী-মা, মনিবের হুকুম আমাকে মানতেই হবে···'

মনিব চোখ পিটপিট করছে; মুখ থেকে কাদা মুছে ফেলবার কোনো গরজ নেই। জিজ্ঞেস করে :

'ইয়েগর! একটা চুলও কি পড়বে না?'

'না···যদি ভগবানের ইচ্ছা না হয়···'

'দাও তো দেখি···'

ঝাঁকড়া চুলওলা প্রকাণ্ড মাথাটাকে বেঁকিয়ে মনিবের নাগালের মধ্যে নিয়ে এসেছে ইয়গর। কসাকটির চুলের ঝুঁটি ধরে মনিব টানতে শুরু করে। ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে কয়েকটি চুল। আলোয় চুলগুলোকে মনিব খুটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, তারপর ইয়েগরের দিকে বাড়িয়ে দেয়।

'লুকিয়ে রাখ···তাই বটে···চুল পড়ে না··'

মনিবের মোটা মোটা আঙুলের ফাঁক থেকে চুলগুলোকে খুব সবধানে তুলে নেয় ইয়েগর, দু'হাতের তালুর মধ্যে গুটলি পাকিয়ে পাকিয়ে একটা বলের মতো করে তোলে, তারপর একটা চডা রঙের ওয়েস্টকোটের পকেটে গুঁজে রেখে দেয়। তার মুখের চেহারা নিত্যকার মতোই ভাবলেশহীন, চোখদুটো মড়ার মতো। হাত-পা নাড়তে গিয়ে টলে টলে উঠছে—সেটুকু না ধরলেও শুধু তার পকেট হাতড়ানোর ভঙ্গি দেখেই বলে দেওয়া যায় মদের নেশাটা তার পক্ষে আরো বেশি মারাত্মক হয়ে উঠেছে।

হাতের একটা ভঙ্গি করে মনিব বিড়বিড করে বলে, 'হাঁ···সাবধানে রেখে দিও···সবকিছুর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে···প্রত্যেকটা চুলের জন্যে···'

দেখে বোঝা যায়, এ ধরনের ব্যাপারে ওরা অভ্যস্ত। ওদের অঙ্গভঙ্গির মধ্যে এক ধরনের যান্ত্রিকতা আছে। স্ত্রীলোকটির তেমন উৎসাহ নেই। শুধু তার কালো শুকনো ঠোঁটদুটো অনবরত নড়ছে।

'গান গাও'! হঠাৎ মনিব হিসিয়ে ওঠে।

ইয়েগর মাথার টুপিটা পিছন দিকে ঠেলে দেয়, মুখটাকে বীভৎস করে তোলে, তারপর কান্নাচাপা নিচু স্বরে ভাঙা ভাঙা গলায় গাইতে শুরু করে :

ডন-পাড়ের ছেলেরা এসেছে এসেছে···

জোড়া-হাত বাড়িয়ে মনিব দাঁড়িয়ে আছে—ভিক্ষে চাইছে যেন।

এসেছে কসাক-দল সাহসী তরুণ···

মনিব মাথা তুলেছে আর হাউ হাউ করে কাঁদছে। চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে দৃষ্টিহীন বীভৎস মুখের উপর দিয়ে। মনে হয়, মুখখানা যেন এক্ষুনি গলতে শুরু করবে।

একদিন বাইরের উঠোনে এমনি ব্যাপার চলবার সময়ে গলিতে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল অসিপ। ফিসফিস করে সে জিজ্ঞেস করে, 'দেখছ তো?'

'কি?'

আমার দিকে তাকিয়ে সে হাসে। ভয়-পাওয়া হাসি, দেখে মায়া হয়। আজকাল তার চেহারাটা খুবই বিশ্রী হয়ে গেছে। তার মঙ্গোলীয় চোখদুটো আরো বড়ো হয়ে গেছে যেন।

'কী বলছ?'

আমার দিকে ঝুঁকে কানে-কানে ফিসফিস করে বলে সে:

'টাকাপয়সা থাকলেই হল—না? তাহলেই সুখী হওয়া যায়—না? ভাখ না কত সুখ! মনে রেখো।···

আর মনিব যখনই এভাবে মদের কেঁড়ে নিয়ে বসে, সাশ্‌কা কেরানি কারখানা-ঘরের মধ্যে এমনভাবে ছুটোছুটি লাগিয়ে দেয় যেন সেও মাতাল হয়ে গেছে। চোখদুটো ধূর্তের মতো চকচক করে। হাতদুটো এমন ঝুলোর মতো ঝুলতে থাকে যে মনে হয় ভাঙা হাত। কোঁকড়া কোঁকড়া লাল চুলগুলো চটচটে কপালের ওপরে কাঁপে। সাশ্‌কার চুরি-চামারির কথা নিয়ে কারখানার সবাই প্রকাশ্যেই আলোচনা করে আর তার সঙ্গে দেখা হলে পিঠ-চাপড়ানির হাসি হাসে।

আর কুজিনের মুখে কেরানির প্রশংসা আর ধরে না। মধুমাখা স্বরে সে বলে:

'লেকজান্দার পেত্রভ লোকটিকে যা-তা ভেব না! ও হচ্ছে ঠিক একটা ঈগলপাখির মতো, অনেক উঁচুতে উঠে যাবে ও, দেখে নিও আমার কথা ফলে কিনা, হ্যাঁ দেখে নিও···'

চুরি করার ব্যাপারে কেউ-ই পিছু-পা নয়। একটা নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের ভাব নিয়ে সবাই চুরি করে। আর চুরির পয়সা সঙ্গে সঙ্গে খরচ হয়ে যায় মদে। মদ খাওয়ার ব্যাপারে তিন কারখানাতেই সমান উৎসাহ। ছোকরা চাকরগুলোকে ভদ্‌কা আনবার জন্যে পাঠানো হয় পানশালায়, তারা শার্টের তলায় বিস্কুট বোঝাই করে নিয়ে যায় এবং কোনো একটা মিষ্টির দোকানে সেগুলোর বদলে মিষ্টি খেয়ে আসে।

জিপসিকে আমি বলি, 'তোমরা যদি এভাবে চলো তাহলে সেমিয়োনভকে কিছুদিনের মধ্যেই লালবাতি জ্বালতে হবে।'

সুন্দর মাথাটা ঝাঁকিয়ে জিপসি বলে: 'বাপু হে, ব্যাপারটা অত সহজ নয়! এই ব্যবসাতে সেমিয়োনভের যতো টাকা খাটছে তার প্রত্যেকটা রুবলের জন্যে সেমিয়োনভের ছত্রিশ কোপক করে লাভ থাকে…'

এমনি ভাবে কথা বলে যেন মনিবের ব্যবসার হালচাল তার নখদর্পণে।

আমি হাসি। বিরস মুখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে পাশা বলে, 'সব ব্যাপারেই কেন যে তোমার মনে এত দুঃখু হয় বুঝি না…এমন স্বভাব হল কেন তোমার?'

'আমার দুঃখু হয়েছে কি হয়নি—কথাটা তা নিয়ে নয়। কিন্তু এখানকার এই ঘোঁটের মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারি না—'

'ঘোঁট ঘোঁটই। তার আবার বোঝাবুঝি কি?' শাতুনভ ফস করে বলে ওঠে। গোটা কারখানার মানুষ অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল।

'এদিকে তো তোমাদের মুখে মনিবের প্রশংসাই শুনি। মুখে তোমরা বলো যে মনিবের মতো এমন চালাক মানুষ নাকি আর হয় না, কত বড়ো একটা ব্যবসা সে গড়ে তুলেছে, এইসব কথা। এর পিছনে তোমাদেরও মেহনৎ আছে, এ কথাটা মনে রেখ। আর সেই তোমরাই কিনা যতোদুর সাধ্য চেষ্টা করছ, ব্যবসাটা যাতে নষ্ট হয়।…'

সঙ্গে সঙ্গে অনেকে একসঙ্গে জবাব দিয়ে ওঠে:

'ব্যবসা নষ্ট করা—তা কেন হতে যাবে!'

'হাতিয়ে নেবার সুযোগ যদি থাকে তো ফস্‌কে যেতে দেওয়াটা ঠিক নয়!'

'মনিব যখন মদের কেঁড়ে নিয়ে বসে তখনই তো আমাদের হাত-পা ছড়াবার একটুখানি অবসর···'

আমার কথাগুলো সাশ্‌কার কানে উঠতে কিছুমাত্র দেরি হয় না। সঙ্গে সঙ্গে রুটির কারখানায় ছুটে আসে সে; পরনের ছাইরঙা পোশাকে চমৎকার মানিয়েছে তাকে—দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে:

'আমার চাকরিটা বাগাবার মতলব—না? সে গুড়ে বালি—যতো বড়ো ধূর্তই তুমি হও না কেন এখনো যথেষ্ট কাঁচা আছ—'

সবাই উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমাদের মধ্যে এখন একটা হাতাহাতি শুরু হয়ে গেলে সবার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। সাশ্‌কা লোকটা যদিও ছটফটে—কিন্তু বিচারবিবেচনাহীন নয়। তাছাড়া আগেই আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে। সে সময়ে অনবরত সে আমার পিছনে লাগত আর নানা তুচ্ছ ব্যাপারে আমাকে নাস্তানাবুদ করতে চেষ্টা করত। ব্যাপারটা শেষকালে আমার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। একদিন তাকে আমি জানিয়ে দিই সে যদি আমার পিছনে লাগা বন্ধ না করে তাহলে একদিন তাকে ধরে আচ্ছা করে ধোলাই দিয়ে ছাড়ব। ব্যাপারটা ঘটেছিল এক ছুটির দিনের সন্ধ্যায় উঠোনে দাঁড়িয়ে। অন্য সবাই ভিতরে চলে গিয়েছিল, শুধু সে আর আমি ছিলাম।

শুনে সে বলেছিল, 'আচ্ছা, হয়ে যাক একহাত!' তারপর গা থেকে জ্যাকেটটা খুলে বরফের ওপরে ছুঁড়ে ফেলে, শার্টের হাত গুটিয়ে নেয়: 'এবার সামলাও দেখি! মুখ বাঁচিয়ে মারতে হবে কিন্তু—শুধু গায়ে গায়ে। দোকানে কাজ করতে হলে মুখটা অক্ষত থাকা দরকার জানো তো···'

শেষ পর্যন্ত সাশ্‌কাকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। আমার হাত ধরে মিনতি করে:

'শোন ভালো মানুষের ছেলে, কাউকে বোলো না যে আমার চেয়ে তোমার গায়ে জোর বেশি। তোমার কাছে এটুকু আমি ভিক্ষে চাইছি! তুমি তো এখানে দুদিনের জন্যে এসেছ; আজ আছ কাল নেই—কিন্তু আমাকে এই

লোকগুলির সঙ্গেই থাকতে হবে! বুঝতে পারলে আমার কথা? বেশ, বেশ! ধন্যবাদ! এসো এক পেয়ালা চা খাওয়া যাক…'

তারপর তার ছোট্ট ঘরটায় আমরা দুজনে এসে বসেছিলাম। ঘরে আর কেউ ছিল না, বসে বসে চা খেয়েছিলাম দুজনে। আবেগের সঙ্গে সে কথা বলে চলেছিল—আর আমি শুনছিলাম তার কথার বাছা বাছা শব্দগুলো।

'শোন ভাল মানুষের ছেলে, সেই যাকে বলে গিয়ে হাত-সাফাই, তা আমার খানিকটা আছে। কথাটা পুরোপুরি সত্যি। আর নিজেদের মধ্যে আপনা-আপনি কথা কইবার সময়ে অস্বীকার করেই বা লাভ কি। কিন্তু এখানে যে অবস্থার মধ্যে থাকতে হয়, তা যদি বুঝে ভাখ…' বলতে বলতে সে টেবিলের ওপর দিয়ে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে যেন কিছু একটা গোপন কথা বলতে চাইছে। অভিমানে চকচক করে ওঠে চোখদুটো, আর ঠিক গান গাইবার মতো করে বলতে শুরু করে:

'সেমিয়োনভের চেয়ে আমি খাটো কিসে? আমার বুদ্ধি কি ওর চেয়ে কম? আমার বয়েস অল্প, চেহারা ভালো, চটপট কাজ করতে পারি—নয় কি? এই তোমাকে বলে রাখছি, একটা সুযোগ যদি আমি পাই, একটুখানি কামড় বসাবার মতো যে কোনো একটা জিনিস, শুরু করবার মতো যা-হোক কিছু একটা ব্যবসা—তা সে যতো ছোটই হোক না কেন—তাহলে দেখে নিও, কত তাড়াতাড়ি আমি ব্যাপারটাকে আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসি, তাক লাগিয়ে দিতে পারি সবাইকে—দেখে চোখ কপালে উঠবে সকলের! আমার যে-রকম স্বাস্থ্য ও চেহারা আছে—তা নিয়ে কোনো টাকাপয়সাওলা বিধবাকে কি আমি বিয়ে করতে পারি না? কী মনে হয় তোমার? কিংবা, যৌতুকসমেত কোনো একজন তরুণীকে বিয়ে করতে চাই যদি? আমি কি যোগ্য পাত্র নই? আমি কয়েক-শো লোককে খাওয়াতে পারি—কিসের বড়াই করে সেমিয়োনভ? ওর দিকে তাকালেও গা ঘিন ঘিন করে…ঠিক যেন একটা বিকটাকার পাঁকাল মাছ—যার থাকা উচিত ছিল পাঁকের মধ্যে সেই কিনা ঘর সাজিয়ে বসেছে! দু চোখের বিষ!'

তার লাল আর লোভী মুখটা কুঁচকে গিয়ে হালকা একটা শিস বেরিয়ে আসে।

'শোন হে ভালো মানুষের ছেলে! বিশপরা তো খুব সৎভাবে জীবন কাটায় —কিন্তু বিশপরা কি নিজেদের জীবনকে খুব সুখের মনে করে? মোটেই না। জীবন তাদের কাছে বড়োই একঘেয়ে আর বিশ্রী—জীবনকে উপভোগ করার ক্ষমতা পর্যন্ত তাদের থাকে না······থানার কেরানি লশ্‌কিনকে তুমি চেন? সে-ই তো 'বিশপের নীতিকথা' নামে রচনাটা লিখেছে। লোকটার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখা যায় বটে কিন্তু একেবারে পাঁড় মাতাল। যাই হোক, ওর লেখা নীতিগল্পের ডীকন সরাসরি বলছে—'প্রভু, আপনি একেবারেই অযৌক্তিক কথা বলছেন। চুরিকে বাদ দিলে জীবনের কোনো অর্থই থাকে না।"

ছিমছাম সুন্দর চেহারা, লাল মাথা—দেখে আমার মনে পড়ে আগেকার কালের বল্লমের কথা। সেই জলন্ত অস্ত্র যা মৃত্যু ও ধ্বংসের অন্ধ বার্তা নিয়ে রাত্রির বুক চিরে ছুটত।

মনিব যে-সময়ে মদের কেঁড়ে নিয়ে পড়ে থাকে—তখন সাশকার তো পোয়া বারো। বাজপাখি যেমন অবস্থায় শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনিভাবে ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে সে রুবল ধরে। দেখে যেমন বিরক্তি বোধ হয়, তেমনি মজাও লাগে।

শাতুনভ আমার কানের কাছে মুখ এনে বলে যায়: 'ব্যাপার স্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, একটা ধরপাকড় হবে। তুমি কিন্তু ধারেকাছে থেকো না। দেখো তোমাকে নিয়ে যেন আবার টানাটানি না হয়···'

আমার দিকে তার মনোযোগটা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। আমাকে খুশি করবার জন্যে সে যে কী করবে ভেবে পায় না। এই সে আমার হয়ে ময়দা ও জ্বালানি-কাঠ নিয়ে আসছে, এই সে আমার হয়ে ময়দা মেখে দিতে চাইছে —তার কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হয়, আমি যেন একটা পঙ্গু লোক।

আমি জিজ্ঞেস করি, 'তোমার মতলবটা কি?'

আমার চোখের দিকে সরাসরি না তাকিয়ে সে বিড়বিড় করে বলে:

'এ নিয়ে মাথা ঘামিও না—যেতে দাও! তোমার গায়ের জোর অন্য সব দরকারী কাজে লাগবে···দেখো যেন নষ্ট না হয়ে যায়। ভালো স্বাস্থ্য পাওয়াটা সহজ কথা নয়—মানুষের জীবনে মাত্র একবারই পাওয়া যায়···'

আর, বলা বাহুল্য, তারপরেই চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করে:

'আচ্ছা, 'শব্দমালা' কথাটার মানে কি?'

কিংবা হয়তো আচমকা একটা অদ্ভুত মতামত প্রকাশ করে বসে:

'জানো তো, 'খ্লিস্তি' গোষ্ঠীর লোকরা মনে করে যে আমাদের মেরীমাতা একজন নন, একজনেরও বেশি। কথাটা পুরোপুরি ঠিক···'

'কি, বলতে চাও কি?'

'এ নিয়ে মাথা ঘামিও না—যেতে দাও।'

'কিন্তু তুমি নিজেই তো বলো যে ভগবান এক এবং তিনি সবারই ভগবান!'

'তাই বটে! কিন্তু ভগবান এক হলেও মানুষ তো আর এক নয়। আলাদা মানুষ নিজেদের আলাদা আলাদা প্রয়োজনের সঙ্গে ভগবানকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে···যেমন ধরো তাতার বা মর্দভিনীয়···সেখানেই তো পাপ!'

একদিন রাত্রে সে আর আমি চুল্লির সামনে পাশাপাশি বসে আছি—সে বলে:

'একটা কথা কি জান···মানুষের যদি হাত-পা ভেঙে যায় বা এমন কিছু একটা অসুখ করে যা একটা ছাপ রেখে যাবে—সেটা খুব যে একটা খারাপ ব্যাপার হবে তা নয়···'

'কী বলতে চাও?'

'মানে আর কি, এই ধরো বিকলাঙ্গ হয়ে যাওয়া...'

'তোমার মাথা ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, খুবই···'

চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে সে তারপরে ব্যাখ্যা করে বলে:

'তাহলে তোমাকে বলি শোন। আমার ইচ্ছে ছিল, আমি যাদুকর হব। যাদুকর হবার জন্যে আমার এতবেশি আগ্রহ ছিল বলবার নয়। মার দিক থেকে আমার দাদামশাই ছিলেন যাদুকর। আমার বাবার কাকাও তাই।

আমাদের ওই অঞ্চলেই তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত যাদুকর এবং গ্রামের ওঝা। মৌচাকও ছিল তাঁর। আমাদের এলাকার সবাই চিনত তাঁকে। এমন কি তাতার, চুভাস ও চেরেমিসিরা পর্যন্ত তাঁকে মেনে চলত। তাঁর বয়েস এখন একশো পেরিয়ে গেছে। বছর সাতেক আগে তিনি একটি তরুণী মেয়েকে বিয়ে করেছেন—এক অনাথ তাতার মেয়ে। ছেলেপিলেও হয়েছে। তিনবার বিয়ে হয়ে গেছে তাঁর—আর বিয়ে করা চলবে না।'

গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে থমথমে স্বরে আস্তে আস্তে সে বলে চলে :

'তুমি হয়তো শুনে বলবে, এসব বুজরুকি! কিন্তু শুধু বুজরুকিই যদি হবে—তাহলে একশো বছর পরমায়ু হতে পারে না! বুজরুকি তো সবাই দিতে পারে—ওতে মনের শান্তি পাওয়া যায় না…'

'রোসো, রোসো! বিকলাঙ্গ হতে চেয়েছিলে কেন?'

'ব্যাপারটা কি জান—এটা হচ্ছে মনের অন্ধকারকে অন্যদিক থেকে ঠেলে দেবার চেষ্টা…আমার ভারি ইচ্ছে করে, সারা পৃথিবীতে আমি ঘুরে বেড়াই…পৃথিবীর কোনো জায়গা বাদ দেব না…যতোদূর যেতে পারি যাব! পৃথিবীর হালচালটা নিজের চোখে দেখতে চাই…জানতে চাই, কেমনভাবে পৃথিবীর মানুষ বাঁচে, কী তাদের আশা! হ্যাঁ, এই আমার ইচ্ছে। কিন্তু যা আমার মূর্তি, আমি যদি এখন তীর্থ করতে বেরিয়ে পড়ি—আমার পক্ষে কোনো ওজর আপত্তি টিকবে না। লোকে জিজ্ঞেস করবে, তা তুমি বাপু এমন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন—মতলবটা কী? উত্তরে যুতসই জবাব পর্যন্ত দিতে পারব না। কাজে কাজেই আমি ভাবছি, আমার হাতদুটো যদি নুলো হয়ে যায় বা সারা গায়ে ঘা বেরোয়, বা… ঘা হওয়াটা ভারি বিশ্রী—লোকে ভয় পায়…'

বলতে বলতে বাঁকা চোখের দৃষ্টি আগুনের দিকে নিবদ্ধ করে সে চুপ করে যায়।

'তুমি কি এ বিষয়ে মনস্থির করে ফেলেছ?'

রেগে উঠে সে বলে, 'মনস্থিরই যদি না করব তাহলে আর তোমার কাছে বলতে গেলাম কি জন্তে। মনস্থির না করে কোনো কিছু বলতে

যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, লোককে অযথা ভয় পাইয়ে দেওয়া। কারণ আর যাই হোক···'

হতাশার ভঙ্গিতে সে হাত নাড়ে।

আর্তেম পায়ে পায়ে দাঁড়ায় আমাদের কাছে। মুখে একটুখানি স্বপ্নাচ্ছন্ন হাসি, উস্‌কোখুস্‌কো মাথাটা ঘষছে। বলে :

'আমি স্বপ্ন দেখছিলাম যে আমি চান করছি—আর আমাকে একটা উঁচু জায়গা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হচ্ছে। দু-পা পিছিয়ে গিয়ে আমি ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম—ঝপাং!—আর ঠাস করে দেওয়ালে আমার মাথাটা ঠুকে গেল! ফোঁটা ফোঁটা সোনালী জল টপ্ টপ্ করে পড়তে লাগল আমার চোখ থেকে ···'

সত্যি সত্যিই তার সুন্দর চোখদুটো জলে ভরে গেছে।

দিন দুয়েক পরে রাত্রিবেলা চুল্লিতে রুটি বসিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, এমন সময় প্রচণ্ড একটা হৈ-হট্টগোলে আমার ঘুম ভেঙে গেল। বিস্কুটের কারখানায় ঢোকবার মুখে খিলানের নিচে মনিব দাঁড়িয়ে। বিশ্রী সব গালাগালি বেরিয়ে আসছে তার মুখ থেকে। ফেটে যাওয়া বস্তা থেকে যেমন মটরদানা ছিট্‌কে বেরিয়ে আসে, তেমনি কুৎসিত সব গালাগালি—ক্রমেই আরো বেশি কুৎসিত হয়ে উঠছে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে মনিবের ঘরে ঢোকবার দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। ভিতর থেকে থপ্ থপ্ করে হামাগুড়ি দিতে দিতে বেরিয়ে এল সাশ্‌কা কেরানি। আর তখন মনিব দু-হাতে দরজার দুই বাজু আঁকড়ে ধরে লোকটার বুকে আর কোমরে লাথি মারতে লাগল। যেন ভয়ানক একটা জরুরি কাজ করছে এমনি একটা তন্ময়তা ছিল সেই লাথি-মারার মধ্যে।

লোকটা ককিয়ে ওঠে, 'মেরে ফেলছে রে···মেরে ফেলছে···'

সেমিয়োনভ এক একবার লাথি মারছে আর খুশির হুঙ্কার ছাড়ছে। প্রত্যেকটা লাথির ঘায়ে উপুড়-হয়ে-পড়ে-থাকা শরীরটা খানিকটা করে গড়িয়ে যাচ্ছে মেঝের ওপর দিয়ে। আর সাশ্‌কা যতোবার চেষ্টা করছে,

দু-পায়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে ততোবারই সে মোক্ষম মার দিয়ে বসিয়ে দিচ্ছে তাকে।

বিস্কুটের কারখানা থেকে লোকগুলো ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে। প্রদোষের আলোয় তাদের মুখগুলোকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তলে তলে একটা ভয় যে পেয়ে বসেছে সবাইকে—সেটুকু বোঝা যায়।

'ভাইসব…মেরে ফেলছে আমাকে…'

কঞ্চির পুরানো বেড়া যেমন বাতাসের ধাক্কায় খসে পড়ে—তাদের অবস্থাটাও তেমনি। সবাই সরে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে এল আর্তেম এবং মনিবের মুখের ওপরে চেরা গলায় চিৎকার করে উঠল:

'বাস, আর নয়!'

সেমিয়োনভ পিছু হটেছে। ঠিক একটা মাছের মতো লাফ দিয়ে সাশ্‌কা মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে, তারপর আর তাকে দেখা গেল না।

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা। নিদারুণ স্তব্ধতা। কে জিতবে—মানুষ না পশু—তারই একটা চরম পরীক্ষার মুহূর্ত।

'কে? কে বলে একথা?' ভাঙা ভাঙা গলায় মনিব হুঙ্কার ছাড়ল। বাটির মতো করে ধরা একটা হাতের তলা দিয়ে কুৎকুৎ করে তাকাচ্ছে, আরেকটা হাত তুলেছে মাথার কাছাকাছি।

'আমি,' অতিরিক্ত রকমের জোর দিয়ে চেচিয়ে উঠল আর্তেম। তারপর পিছু হঠে এল। মনিব তেড়ে গেল তার দিকে, কিন্তু অসিপ ছুটে এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। মনিবের ঘুষিটা গিয়ে লাগল অসিপের মুখে।

'শুনুন, আপনাকে বলি,' শান্ত স্বরে বলল সে, মুখ ফিরিয়ে গলা থেকে একদলা থুতু ফেলল, 'হাত সামলে রাখুন, মারপিট করবেন না!'

আর পর মুহূর্তেই দেখা গেল, অনেকেই উগ্র ভঙ্গিতে মনিবের চারদিকে ঘন হয়ে এসেছে। তাদের মধ্যে আছে পাশ্‌কা, সৈনিক, শান্ত স্বভাবের লাপতেভ, ফোটানী নিকিতা। সবার হাত পিছনদিকে বা পকেটে ঢোকানো, মাথা

নিচু করা। দেখে মনে হয়, সবাই যেন মনিবকে ঢুঁ মারতে চাইছে, আর অস্বাভাবিক উঁচু গলায় একসঙ্গে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে।

'বাস্, আর নয়—যথেষ্ট হয়েছে! আমরা কি কেনা গোলাম নাকি? এই বলে রাখছি, আর আমরা সহ্য করব না!'

মনিব নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। পোকা-খাওয়া এবড়োখেবড়ো মেঝেটার সঙ্গে আটকে গেছে যেন। হাতদুটো মুড়ে রেখেছে ভুঁড়ির ওপরে, শরীরটা পিছন দিক একটু হেলানো। দেখে মনে হয়, সে যেন এইসব আপাত-অবিশ্বাস্য চিৎকার কান পেতে শুনছে। দেওয়ালের বাতির হলদে শিখায় মানুষগুলোকে দেখাই যাচ্ছে না প্রায়। হট্টগোল বেড়েই চলেছে ক্রমশ আর সেই কালো মানুষের জনতা ফুঁসে উঠছে তার চারদিকে। এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে একটা মাথা আর বেরিয়ে-পড়া দাঁত। অস্পষ্ট আলোয় দাঁতগুলোকে এমন থমথমে দেখায় যে মনে হতে পারে, দাঁতগুলোর সঙ্গে মূল শরীরের কোনো সম্পর্ক নেই। সবাই হুটোপাটি লাগিয়েছে, সোরগোল তুলেছে। তারপর শোনা যায় সবার গলা ছাপিয়ে ফোটানী নিকিতার গলার স্বর:

'আমার শরীরে আর এতটুকুও ক্ষমতা নেই—সবই আপনি শুষে নিয়েছেন! এবার ভগবানের কাছে গিয়ে কী কৈফিয়ৎ দেবেন শুনি? মানুষ হয়ে মানুষের কী হেনস্তা!'

চারপাশ থেকে শোনা যাচ্ছে প্রচণ্ড গালাগালি। নাড়া-খাওয়া গাঁজলা-ধরা গালাগালি। তারপর সেমিয়োনভের নাকের নিচেই কেউ কেউ ঘুষি নাচাতে লাগল। মনিবকে দেখে মনে হয়, সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে।

'কাদের দৌলতে বড়লোক আপনি? আমাদের!' আর্তেম চেঁচিয়ে ওঠে। আর জিপসি এমন গড়গড় করে কথা বলে যেন সে কোনো একটা বই থেকে পড়ছে:

'আপনি মনে রাখবেন, দিনে সাতবস্তা ময়দা নিয়ে কাজ করতে আমরা আর রাজি নই।...'

মনিব হাত নামিয়ে নিল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে চলে গেল। তার মাথাটা বড়ো অদ্ভুতভাবে নড়বড় করছে।

তারপর বিস্কুটের কারখানার লোকগুলির মন জুড়ে বসে গভীর একটা প্রশান্তি—যার মধ্যে আনন্দের ভাগটুকুও কম জীবন্ত নয়। ব্যাপারটাকে কেউ হাল্‌কাভাবে নেয়নি, যথোচিত গুরুত্ব দিয়েছে। কাজে লেগে গেছে রীতিমত উৎসাহের সঙ্গে, একেবারে যেন নতুন এক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে একজন অপরজনের দিকে—সেই দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে বিশ্বাস, সহৃদয়তা, কুণ্ঠা। শোনা যাচ্ছে জিপসির হাঁকডাক :

'কই হে, এবার হাত-পা চালাও দেখি, চুপটি করে থেকো না! সাবাস!... বহুত আচ্ছা! কাজ কাকে বলে আমরা দেখিয়ে দেব! এসো সবাই, লেগে পড়ো দেখি!'

কাঁধে একবস্তা ময়দা নিয়ে শাতুনভ দাঁড়িয়ে ছিল কারখানা-ঘরের মাঝখানটিতে। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে আর ঠোঁটের শব্দ করে বলে :

'দেখেছ তো ভাই··· এককাঠ্‌ঠা হয়ে দাঁড়াতে পারলে কী কাণ্ডই না করা যায়···'

শাতুনভ নুন ওজন করছিল। বেশ জোর গলায় বলে :

'বাচ্চারা যদি এক হয়ে দাঁড়ায় তো বাপকেও হারিয়ে দিতে পারে।'

লোকগুলিকে দেখে বসন্তকালের মৌমাছির মতো মনে হচ্ছে। বিশেষ করে আর্তেমেরই যেন সবচেয়ে বেশি উল্লাস। একমাত্র কুজিনই তার স্বভাবসিদ্ধ গলায় প্যানপ্যান করে চলেছে :

'হতচ্ছাড়ারা, কী ভেবেছিস তোরা এ্যাঁ?···'

সীসের মতো হিম কুয়াশা। বাড়ির চূড়ো, গম্বুজ আর ঘণ্টাঘর ডুবে গেছে কুয়াশার মধ্যে। শহরের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, শহরের শিখরদেশের কোনো অস্তিত্ব নেই। দূর থেকে মানুষগুলোও যেন মস্তক-হীন। গুঁড়ি গুঁড়ি ঠাণ্ডা বৃষ্টি জড়িয়ে আছে বাতাসের সঙ্গে—দম আটকে আসে। চারদিকে সমস্ত কিছুতে একটা ম্যাটমেটে রূপোলী রঙের ছোপ; আর যেখানে রাত্রির আলো নিবিয়ে ফেলা হয়নি সেখানে মুক্তোর মতো রঙ।

ছাদ থেকে টপ্ টপ্ করে জলের ফোঁটা পড়ছে। শানবাঁধানো জমির ওপরে জলের ফোঁটা পড়ার বিশ্রী একঘেয়ে আওয়াজ। রাস্তার পাথরের ওপরে ঘোড়ার খুর খট্ খট্ শব্দে বেজে ওঠে। আর কুয়াশার ওপর দিয়ে কোথা থেকে যেন ভেসে আসে আজানের ডাক। মানুষটাকে দেখা যায় না; কাঁপা কাঁপা বিষণ্ণ স্বরে সে ভোরের নামাজ পড়বার জন্তে ডাক দিয়ে চলেছে।

আমার পিঠে ছিল একঝুড়ি মিষ্টি রুটি। যতোই আমি হাঁটছি, ততোই মনে হচ্ছে, হাঁটার আর শেষ নেই। আমি যেন চলেছি কুয়াশা পার হয়ে হয়ে, মাঠ আর প্রান্তর ছাড়িয়ে, রাজপথ আর পায়ে চলা রাস্তার ওপর দিয়ে—চলেছি অনেক দুরের কোনো দেশে যেখানে বসন্তের সূর্য নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে আকাশে উঠে এসেছে।

কুয়াশা থেকে বেরিয়ে এসে একটা ঘোড়া আমার পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। ঘাড়টা বেঁকানো, সামনের পায়ে লম্বা লম্বা ডিঙি মেরে চলেছে। ছাইরঙা মস্ত ঘোড়া, সারা গায়ে গাঢ় রঙের ফুটফুট দাগ। লাল টকটকে চোখে রুষ্ট চাউনি। কোচোয়ানের আসনে লাগাম টেনে বসে আছে ইয়েগর। কাঠের মূর্তির মতো খাড়া আর টান-টান। পিছনে গাড়ির কামরার মধ্যে বসে বসে ঢুলছে মনিব। গরম পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার গায়ে পুরু শেয়াল-কোট।

এই ছাইরঙা বেয়াদপ ঘোড়াটা একাধিক বার গাড়িটাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। একবার তো ইয়েগর আর মনিবকে বাড়ি নিয়ে আসা হয়েছিল কাদা-রক্ত-মাখা আর হাড়গোড়-ভাঙা অবস্থায়। কিন্তু দুজনেই এই জানোয়ারটিকে ভালবাসে। জানোয়ারটিকে ভালো খাওয়ানো দাওয়ানো হয়; জানোয়ারটির হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, ক্ষীণদৃষ্টি টকটকে চোখদুটোতে নিরীহ ও বোকা-বোকা চাউনি।

একবার ঘোড়াটা ইয়েগরের কাঁধে কামড়ে দিয়েছিল। কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায়, ইয়েগর ঘোড়াটাকে মাজাঘষা করছে। আমি পরামর্শ দিই যে এই হিংস্র জানোয়ারটাকে তাতারদের কাছে বিক্রি করে দেওয়াই ভালো;

তাতাররা ওটাকে কসাইখানায় নিয়ে যাক। কথাটা শুনে খাড়া হয়ে দাঁড়ায় ইয়েগর তারপর ঘোড়ার লোম আঁচড়াবার ভারী খড়্‌রাটা আমার মাথার দিকে তাক করে হুঙ্কার ছাড়ে :

'দূর হও!'

তারপর থেকে সে আর কোনো দিন আমার সঙ্গে কথা বলেনি। যদি কখনো আমি তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চেষ্টা করেছি, সে ষাঁড়ের মতো মাথা নিচু করে সরে গেছে। মাত্র একদিন সে পিছন থেকে আমার কাঁধ আঁকড়ে ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বিড়বিড় করে বলেছিল :

'শোন হে 'কাৎসাপ' তোমার চেয়ে আমার গায়ে ঢের ঢের বেশি জোর! তোমার মতো তিনটেকে আমি সাবাড় করে দিতে পারি। তোমাকে শায়েস্তা করা তো আমার একহাতের ব্যাপার। কথাটা মাথায় ঢুকছে? শুধু একবার যদি মনিব······'

কথাগুলো বলবার সময়ে সে এতবেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল এবং সেই উত্তেজনা তাকে এতবেশি কাহিল করে ফেলেছিল যে কথাগুলো সে শেষ করতে পারে নি। রগের পাশে নীল শিরাগুলো দপ্‌ দপ্‌ করেছিল আর সারা মুখে ঘাম ছুটেছিল।

মুখফোড় ইয়াশ্‌কা এই লোকটির সম্পর্কে বলে :

'ওর ঘুথির জোর তিন-তিনটে মানুষের থমান বটে কিন্তু লোকটা একেবারে হাঁদারাম!'

রাস্তাটা আরো সরু হয়ে ওঠে, বাতাস হয় আরো স্যাঁতসেঁতে। আজানের ডাক থেমে গেছে। ঘোড়ার খুরের খটাখট্‌ শব্দ মিলিয়ে গেছে দূরে। এখন চারদিকে শুধু একটা থমথমে ভাব—যেন কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

বাচ্চা ইয়াশ্‌কা আমাকে দরজা খুলে দিল। ওর পরনে পরিষ্কার লালচে শার্ট আর সাদা এপ্রন। ধরাধরি করে চুবড়িটা ভিতরে নিয়ে যেতে যেতে চাপা গলায় সাবধান করে দিল আমাকে :

'মনিব···'

'আমি জানি।'

'মেজাজ খারাপ…'

ঠিক সেই মুহূর্তে আলমারির পিছন থেকে শোনা গেল একটা ঘোঁৎ-ঘোঁৎ গলার আওয়াজ :

'বকবক-মহারাজ, এদিকে শুনে যাও তো একবার…'

বিছানার ওপরে প্রায় এক তৃতীয়াংশ জুড়ে সে বসে আছে। একপাশে কাত হয়ে সোফিয়া শুয়ে ; পরনের পোশাক তার শরীরের আধাআধির বেশি ঢাকতে পারেনি ; মুড়ে রাখা হাতের তালুদুটোকে বালিশ বানিয়ে গাল পেতেছে। একটা পা চলে গেছে মনিবের হাঁটুর তলা দিয়ে, অন্য পা-টা অনাবৃত—সেটা গেছে ওপর দিয়ে। পরিষ্কার টলটলে চোখের হাসিহাসি চাউনি নিয়ে আমার দিকে তাকাল সে। বোঝা যাচ্ছে, মনিবকে আয়ত্তে আনতে পেরেছে ও। মাথার ঘন চুলের অর্ধেকটা বিনুনি করা, বাকি অর্ধেকটা লুটিয়ে পড়েছে একটা দলা-পাকানো লাল বালিশের ওপরে। মনিব একহাতে ধরে আছে মেয়েটির ছোট্ট পায়ের পাতা, অপর হাতে মেয়েটির বুড়ো আঙুলের হাতীর-দাঁতের-মতো-নখ খুঁটছে।

'বোসো, তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে হে…'

সোফিয়ার পায়ের পাতার ওপরে মৃদু চাপড় দিয়ে সে হাঁক ছাড়ল :

'ওহে ইয়াশকা, সামোভার নিয়ে এস! সোভা, ওঠো তো দেখি…'

আলস্যজড়ানো স্বরে শান্তভাবে মেয়েটি জবাব দেয় :

'আমার ইচ্ছে করছে না…'

'হয়েছে, হয়েছে, উঠে পড়ো তো!'

হাঁটুর ওপর থেকে মেয়েটির পা ঠেলে সরিয়ে দেয়, তারপর খক্ খক্ করে কেশে আস্তে আস্তে বলে :

'আমাদের ভালো লাগুক আর না লাগুক, কিছু কিছু কাজ আমাদের করতেই হয়, কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া চলে না! জীবনটাই হয়ে উঠেছে বেকানুনী…'

হুদ্দাড় করে সোফিয়া মেঝের ওপরে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার দু-পায়ের হাঁটুর ওপর পর্যন্ত অনাবৃত। ভর্ৎসনার সুরে মনিব বলে :

'সোভা, তোমার লজ্জাসরম বলে কিছু নেই দেখছি···'

চুলের বিনুনি করতে করতে হাই তুলে মেয়েটি বলে :

'আমার লজ্জাসরম নিয়ে তোমার কত মাথাব্যথা !'

'আমি একা থাকলে তো কথাই ছিল না···আমি একা আছি কি ? এখানে আর একজন যুবক রয়েছে···'

'ও আমাকে চেনে···'

ইয়াশ্‌কা সামোভার নিয়ে এসেছে। থমথমে টান ভুরু, ফুলো গাল। সামোভারটা ছোটখাটো, পরিচ্ছন্ন, জাঁক করে বলবার মতো পরিষ্কার; দেখতে অনেকটা মনিবেরই চেহারার মতো।

'দূর ছাই !' বলে সোফিয়া টান মেরে মেরে বিনুনিটা খুলে ফেলে, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে কোঁকড়ানো চুলগুলোকে কাঁধের ওপরে ফেলে বসে এসে টেবিলের সামনে।

'শোন তাহলে,' চিন্তাগ্রস্তভাবে কুচুটে সবুজ চোখটাকে সরু করে আর মরা চোখটাকে একেবারে বুজিয়ে মনিব বলতে শুরু করে, 'তোমার শিক্ষা পেয়ে পেয়েই ওরা এমন একটা হট্টগোল পাকিয়ে তুলতে সাহস পেয়েছে !'

'আপনি তো জানেন···'

'জানি বৈকি···তোমার নিজের কি বলার আছে বলো !'

'বড়ো কষ্টের জীবন ওদের !'

'তাই তো ভালো ! আমি তাই চাই ! আরামের জীবন আর কার আছে !'

'কেন আপনারই তো আছে !'

'আহা-হা !' মনিব মুখ ভেঙচিয়ে ওঠে, 'বুদ্ধির বৃহস্পতি ! ওকে একটু চা ঢেলে দাও তো সোভা। আর লেবু আছে ? আমাকে লেবু দিও···'

টেবিলের ওপরে উঁচুতে বাতাস-চলাচলের জানলায় একটা মরচে ধরা পাখা গুন গুন শব্দে ঘুরে চলেছে। গুন গুন করছে সামোভারটাও। মনিবের গলার স্বর এই শব্দকে চাপা দিতে পারেনি।

'কথা বাড়িয়ে লাভ নেই—সাফ বলে দেওয়া যাক। তোমার জন্যেই লোকগুলো এত বেকানুনী হতে পেরেছে, তোমাকেই লোকগুলোর মধ্যে

কানুন ফিরিয়ে আনতে হবে। ঠিক কথা বলিনি ? এটুকু যদি করতে না পার—তাহলে বুঝতে হবে তুমি একটা নিমকহারাম। ঠিক বলিনি সোভা ?'

'কি জানি বাপু। এসব কথা শুনতে আমার ভালো লাগে না।' শান্ত স্বরে মেয়েটি বলে।

মনিবের চোখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে :

'কিছুই তোমার ভালো লাগে না—একেবারে বোকুচণ্ডী! কি করে তোমরা যে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে বুঝি না!'

'সে শিক্ষা তোমার কাছ থেকে না নিলেও আমার চলবে…'

মেয়েটি চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে রইল। ছোট নীল একটা পেয়ালায় চা ঢেলেছে, পাঁচটা চিনির বড়ি দিয়েছে তার মধ্যে—তারপর চা-টা নাড়ছে। পরনের সাদা ব্লাউজের সামনের দিকটা খোলা। দেখা যাচ্ছে মস্ত সুডোল একটা স্তন, রক্তের উচ্ছ্বাসে উঁচু উঁচু হয়ে থাকা নীল শিরা। বেখাপ্পা মুখটাকে দেখাচ্ছে ঘুম-ঘুম বা চিন্তাগ্রস্ত; ঠোঁটদুটো শিশুর মতো ফাঁক হয়ে রয়েছে।

'তাহলে, ঠিক আছে তো,' মনিব বলে চলেছে, উজ্জ্বল হয়ে ওঠা দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখছে আমার মুখটা, 'সাশ্‌কার জায়গায় তোমাকে আমি বসাতে চাই—বুঝেছ ?'

'ধন্যবাদ। আমি রাজি নই।'

'কেন, রাজি নও কেন ?'

'একাজ আমার পছন্দ হয় না…'

'কী বলতে চাও ?'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমার আত্মার সায় পাই না…'

'আবার সেই আত্মা!' ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে সে। বাছা বাছা শব্দ ব্যবহার করে আত্মাকে গালাগালি দেয়। তারপর তীব্র একটা জ্বালা নিয়ে সমানে চোটপাট করে চলে :

'মানুষের আত্মা নিয়ে যতো সব বড়ো বড়ো কথা। আত্মাকে একবার হাতের মুঠোয় পেলে হাতের নখ দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেখে নিই—কী জিনিস

দিয়ে ওটা তৈরি! এক অদ্ভুত ব্যাপার—সবাই আত্মার কথা বলে—অথচ আত্মাকে কোনো দিন চোখে দেখা যাবে না! যেটুকু চোখে পড়ে তা হচ্ছে শুধু নির্বুদ্ধিতা, আর কিছু নয়। তাও আলকাতরার মতো চটচট করে—ভারি বিশ্রী···যদি এমন লোকের সাক্ষাৎ পাও যার মধ্যে ছিটেফোঁটা ভালোমানুষিও আছে—তাহলে দেখে নিও, সেই লোকটা নির্ঘাৎ বোকা না হয়ে যায় না···'

চোখের পাতা আর ভুরু আস্তে আস্তে ওপরের দিকে তুলে সোফিয়া তাকিয়েছে। তারপর ব্যঙ্গের হাসি হেসে খুশিভরা স্বরে জিজ্ঞেস করল :

'তোমার সঙ্গে কোনো দিন কোনো সৎ লোকের সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা জানতে ইচ্ছে করে!'

'আমার বয়স যখন অল্প ছিল, তখন আমি নিজেই সৎ ছিলাম!' বুকের ওপরে চাপড় মারতে মারতে কেমন এক অপরিচিত স্বরে সে বলে চলেছে। বলতে বলতে টোকা দিচ্ছে মেয়েটির কাঁধে।

'এই ধরো না কেন! এখন তুমি হয়তো সৎ আছ, কিন্তু তাতে লাভটা কী? তুমি একটি আস্ত বোকা! তাহলেই দেখছ তো?'

মেয়েটি হেসে ওঠে—মনে হয়, হাসির সবটুকুই আন্তরিক নয়—বলে, 'এতক্ষণে খাঁটি কথা বলেছ···মানুষ বলতে যাদের তুমি দেখেছ সবাই আমার মতো···সৎপথে চলে এমন মেয়েলোককে তুমি দেখনি···'

দু-চোখে আগুন ঝরিয়ে উত্তেজিত স্বরে সে চিৎকার করে ওঠে :

'কাজ করতে আমি পিছু-পা ছিলাম না! সবাইকে সাহায্য করতে রাজি ছিলাম। এমনি মানুষ ছিলাম আমি! সেই জীবনই ভাল লাগতো আমার—মানুষকে সাহায্য করতে পারা, নিজের চারপাশের জীবনকে সুন্দর করে তোলা··· কিন্তু আমি অন্ধ নই। যখন দেখা যায়, সবাই তোমাকে উকুনের মতো ছেঁকে ধরেছে···'

ভারি বিশ্রী লাগে এসব কথা শুনতে। চোখে জল এসে যায়। একটা অর্থহীন যন্ত্রণা, বাইরের কুয়াশার মতো একটা স্যাঁতসেঁতে আর ঘোলাটে অনুভূতি চেপে বসে বুকের ওপরে। এই মানুষগুলির সঙ্গে বাস করা? বেশ বুঝতে পারা যায়, এদের দুর্দশার কোনো সমাধান নেই, সারা

জীবন ধরে দুর্দশার মধ্যে ডুবে থাকবে এরা, এদের হৃদয়ে ও মনে জৈবিক বিকলতা এসেছে। করুণায় বুকের ভিতরটা মোচড়াতে থাকে, আর এদের যে কোনো দিক দিয়ে সাহায্য করবার কিছু নেই সেই অসহায়তার বোধটুকু চেপে বসে একটা গুরুভারের মতো। এদের মধ্যে এসে এই নামহীন ব্যাধি সংক্রামিত হয়েছে আমার মধ্যে।

'এই নাও, বিশটা রুবল নাও—হুইট্‌সান পরবের সময়ে আবার দেখা যাবে। কেমন?'

'না।'

'আচ্ছা, পঁচিশ? নাও হে, নাও! ফুর্তি করো গিয়ে, মেয়ে চাও মেয়ে, যা চাইবে তাই···'

আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, মনিবকে এমন কিছু বলি যাতে সে বুঝতে পারে—আমাদের দুজনের পক্ষে একই জায়গায় থাকা এবং একসঙ্গে চলা আর কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু কি-ভাবে কথাটা বুঝিয়ে বলব, সে-ভাষা খুঁজে পাই না। অবিশ্বাস্য রকমের স্থির দৃষ্টিতে উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠ হয়ে মনিব তাকিয়ে থাকে অ সেই দৃষ্টির সামনে আমি অস্বস্তি বোধ করতে থাকি।

চায়ের পেয়ালায় আরো চিনি দিয়ে সোফিয়া বলে, 'মানুষটার পিছনে কেন লেগেছ বলো তো!'

মনিব মাথা নাড়ে: 'চায়ের মধ্যে অমন ঠেসে চিনি দেওয়া হচ্ছে কেন শুনি?'

'কেন, তোমার বুঝি হিংসে হচ্ছে?'

'শাকচুন্নীর মতো অমন চিনি খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষের খারাপ! একবার গতরের দিকে তাকিয়ে ছাখ তো—দিনে দিনে গতর কি-রকম ফুলে যাচ্ছে···যাক্ গিয়ে, তাহলে এই হল গে তোমার কথা! আমাদের মধ্যে বনিবনা হতে পারে না—কেমন! তুমি চিরকালের মতো আমার পরম শত্রু থেকে যাবে—এই তো?'

'আমি চাই যে আপনি আমাকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিন···'

'বটে বটে···তাই তো!' আঙুল দিয়ে টোকা দিতে দিতে চিন্তান্বিত স্বরে মনিব বলে, 'আচ্ছা···তাহলে! জানো তো, সাধলে যে নেয় না, চাইলে সে পায় না। নাও, চা খেয়ে নাও, হাত তুলে রইলে কেন··· আমাদের দেখা হয়েছিল বিনা আনন্দে, বিদায় নিলাম বিনা ঘুষোঘুষিতে···'

অনেকক্ষণ ধরে নিঃশব্দে আমাদের চা-পান চলল। সামোভার থেকে গব্-গব্ আওয়াজ হচ্ছে, যেন একটা খুশি হয়ে ওঠা পায়রার ডাক। বাতাস চলাচলের জানালায় পাখাটা প্যানপ্যান করে চলেছে বুড়ী ভিখিরির মতো। সোফিয়া তাকিয়ে আছে চায়ের পেয়ালার দিকে, চিন্তাভার-মুখে হাসছে।

মনিবের গলার স্বরে হঠাৎ আবার খুশির সুর; মেয়েটিকে বলে, 'কি গো সোভারানী, অত কি ভাবছ? পয়সা দেব নাকি? চাপা দাও গো, চাপা দাও!'

চমকে উঠে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল মেয়েটি। কথা বলেছিল আস্তে আস্তে, নিষ্প্রাণ একঘেয়ে গলার স্বর—যেন খুবই অসুস্থ। আর তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল আশ্চর্য কতগুলি কথা—যা চিরকাল আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থেকেছে।

মেয়েটি বলেছিল, 'আমি ভাবছিলাম কি জান—বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে বিয়ে হয়ে যাবার পরে বর-কনেকে গির্জার মধ্যেই আটক করে রাখা উচিত···আর কেউ থাকবে না সেখানে···এই করতে পারলেই ঠিক হয়...'

'থুঃ, থুঃ,' মনিব থুতু ফেলে, 'কি আবোলতাবোল সব কথাই না ভাবতে পারো···'

ভুরু কুঁচকে টেনে টেনে মেয়েটি বলে, 'তা-ই বটে! আমি জোর গলায় বলতে পারি যে তাহলে ব্যাপারটা আরো পোক্ত হবে···তাহলে তোমাদের মতো বদ মানুষগুলো···'

টেবিলটাকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিয়ে মনিব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। 'থাম তো দেখি! আবার সেই পুরনো কথা নিয়ে প্যানপ্যানানি!'

মেয়েটি নির্বাক। চায়ের বাসনপত্র সাজিয়ে রাখছে।

আমি উঠে দাঁড়াই।

ভারী গলায় মনিব বলে, 'আচ্ছা, যাও তুমি। যাও তাহলে। ভালোই হয়েছে!'

রাস্তায় তখনো কুয়াশার জড়াজড়ি। ঘোলাটে কান্নার মতো জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে বাড়ির দেওয়াল থেকে। স্যাঁৎসেঁতে বিষণ্ণ আবহাওয়া। কালো কালো এককেটা মূর্তি সঙ্গীহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে। কামারশালায় কাজ হচ্ছে কোথায় যেন—তালে তালে দুটো হাতুড়ি ঠোকার শব্দ। মনে হয়, হাতুড়িদুটো যেন প্রশ্ন করছে:

'এরা কি মানুষ? এই কি জীবন?'

শনিবার আমার শেষ মাইনে। রবিবার সকালে কারখানার লোকরা একটা বিদায়-ভোজসভার আয়োজন করেছিল। সভাস্থল একটা পানশালা; ছোট বটে কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যকর। সেখানে জড়ো হয়েছিল শাতুনভ, আর্তেম, জিপসি, শান্ত স্বভাবের লাপতেভ, সৈনিক, ফোটানী নিকিতা আর ভানোক উলানভ। শেষোক্ত জন পায়ে চাপিয়েছে বুটজুতো, পরনে শস্তা পশমী ট্রাউজার, আনকোরা লাল-সুতীর শার্ট, কাচের বোতাম লাগানো চকচকে ওয়েস্টকোট। সাজপোশাকের এই বৈশিষ্ট্য ও চাকচিক্য তার বেপরোয়া চোখের অশিষ্ট ঝলককে চাপা দিয়েছে যেন। কুঁকড়ে যাওয়া ছোট্ট মুখখানাকে ভারি গোবেচারা দেখাচ্ছে, হাত-পা নাড়ার ভঙ্গির মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে সতর্ক অনুত্তেজনা। দেখে মনে হয়, সব সময়েই তার ভয়, এই বুঝি তার পোশাকে ময়লা লেগে যাবে, এই বুঝি কেউ এসে তার সরু বুকের ওপরে চাপানো ওয়েস্টকোটটাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

আগের দিন সন্ধ্যায় কারখানার সবাই স্নানাগারে গিয়েছিল। আজ সবাই চুলে তেল দিয়েছে। চকচক করছে সবার চুল—ছুটির দিনের মতো।

গোটা অনুষ্ঠানের দায়িত্ব জিপসির ওপরে। এমনভাবে হাঁকডাক করছে যেন স্ফূর্তির সওদা নিয়ে বসেছে সে।

'কে আছ হে—একটু গরম জল আন তো দেখি!'

আমরা এক নিশ্বাসে চা ও ভদ্‌কা খাচ্ছি। দেখতে না দেখতে একটা হালকা ও চাপা নেশা আচ্ছন্ন করল আমাদের। লাপ্‌তেভ আমার কাঁধে কাঁধ ঘষছে আর আমাকে দেওয়ালের দিকে ঠেলতে ঠেলতে অনবরত বলছে :

'এসো, যাবার আগে তোমার সঙ্গে শেষবারের মতো একটু কথা বলে নিই …আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে তুমি…পষ্টাপষ্টি হক্ কথা…সেটাই তো এখন আমাদের সবচেয়ে বড়ো দরকার !…'

শাতুনভ বসেছে আমার উল্‌টো দিকে। চোখ নিচু করে টেবিলের নিচের দিকে তাকিয়ে নিকিতাকে বোঝাচ্ছে :

'জান তো, মানুষ আর কী, আজ আছে, কাল নেই…'

ফোটানী বিষণ্ণভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে : 'কে জানে কোথায় যায় মানুষ… কি ভাবে যায়…'

সবাই এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে যে আমি বড়ো বিব্রত বোধ করছি, আমার বুকের ভেতরটায় মোচড় দিয়ে উঠছে। হয়তো আমাকে চলে যেতে হবে অনেক দূরে, হয়তো এই লোকগুলির সঙ্গে আমার আর কোনো দিনই দেখা হবে না—কিন্তু আজ বড়ো অদ্ভুতভাবে ওদের একান্ত আপন ও প্রিয়জন বলে মনে হচ্ছে

'কিন্তু আমি তো এই শহরেই থাকব। মাঝে মাঝে দেখা হবে আমাদের…' বারবার আমি ওদের মনে করিয়ে দিই।

জিপ্‌সি তার কপালের ওপরে এসে পড়া কালো চুলের গুচ্ছকে মাথা ঝাঁকিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে আর উৎকণ্ঠার সঙ্গে সতর্কভাবে নজর রাখছে যেন চা ঢালবার সময়ে সবার পাত্রে সমান কড়া লিকার পড়ে। গলা খাঁকারি দিয়ে গমগমে স্বরে বলে :

'তা তুমি শহরে থাকতে পার বটে কিন্তু একই ছারপোকার কামড় খাওয়ার দোস্ত আর থাকবে না।'

স্মিত হেসে নরম স্বরে আর্তেম মন্তব্য করে :

'একই গানের কলি গাইবার দোস্তও আর নয়…'

পানশালার ভিতরটা গরম। নানা ধরনের সুগন্ধ এসে নাকে

লাগছে, খিদে জাগিয়ে তোলে। কুয়াশার মতো নীল ঢেউ তুলে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে 'মাখোরকা' ধোঁয়া। কোণের একটা খোলা জানালা দিয়ে অবারিতভাবে এসে ঢুকছে পরিষ্কার বসন্ত-দিনের মাথা-ঝিমঝিম-করা শব্দ। কেঁপে উঠেছে লালচে-নীল স্কুচ্‌শিয়া ফুলের মুয়ে-পড়া স্তবক, নড়ে উঠছে খাঁজ-খাঁজ-কাটা ছোটা ছোট পাতাগুলি।

ঠিক আমার সামনের দেওয়ালে রয়েছে একটা ঘড়ি। ঘড়ির পেণ্ডুলামটা নিশ্চল হয়ে ঝুলে আছে; যেন ভারি ক্লান্ত। কাঁটাহীন কালো ডায়ালটা শাতুনভের চওড়া মুখের মতো। তবে শাতুনভের মুখখানা অন্য দিনের চেয়েও আজ যেন আরো বেশি থমথমে।

বারবার একই কথার ওপর জোর দিয়ে সে বলে চলে, 'আমি তোমাদের বলি শোন, মানুষ আজ আছে কাল নেই···যে যার রাস্তায় চলে যায়···'

মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, আচমকা একটু হাসির দমকে চোখদুটো বুজে আছে আলতোভাবে। বলে:

'আমার কি ভাল লাগে জানো! সন্ধ্যের সময় গেটের ধারে চুপচাপ বসে থাকি আর তাকিয়ে তাকিয়ে মানুষজনের যাতায়াত দেখি···অচেনা সব মানুষ···কোথায় তারা চলেছে জানা নেই···আর কে বলতে পারে, ওদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা সত্যিই খাঁটি মানুষ···ঈশ্বর ওদের মঙ্গল করুন!···'

বলতে বলতে চোখের পাতা ঠেলে ফোঁটা ফোঁটা জল বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু বেরিয়ে আসার পরেই হঠাৎ আর দেখা যায় না। মনে হতে থাকে, ঝল্‌সে-ওঠা মুখের চামড়ার ছোঁয়া লেগে চোখের জল মুহূর্তের মধ্যে বাষ্প হয়ে উবে গেছে। কাঁপা-কাঁপা স্বরে আবার বলে:

'ঈশ্বর ওদের মঙ্গল করুন! আর এসো, আমরাও সকলে পান করি যেন আমাদের বন্ধুত্ব, প্রীতি ও সদ্ভাব বজায় থাকে!

ঢক ঢক শব্দে আমরা পানপাত্র নিঃশেষ করি। একজন আরেক জনকে সশব্দে চুমু-খাই। আর এসব করতে গিয়ে জিনিসপত্রে ভর্তি টেবিলটাকে প্রায় উল্‌টে ফেলি আর কি। আমার বুকের মধ্যে যেন

কোকিল গান গেয়ে উঠছে। লোকগুলির প্রতি ভালোবাসায় টনটন করছে বুকের ভিতরটা। জিপসি হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তার মোচটাকে সমান করে নেয়। মনে হতে থাকে—তার ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা একটুখানি বাঁকা হাসিও সে এইসঙ্গে মুছে নিয়েছে। তারপর সে ঠিক তেমনিভাবে একটি বক্তৃতা দেয় :

'ভাইসব, পোভুর কী লীলা! মাঝে মাঝে বুকের ভেতরটায় খাসা বাশি বেজে ওঠে যেন! ঠিক যেন মর্দভিনীয়দের ধম্মের গান গাইবার তারের বাশির মতো! এই সেদিনের কথাই ধরো না কেন—যেদিন আমরা সবাই একজোট হয়ে সেমিয়োনভের সামনে রুখে দাঁড়িয়েছিলাম!··· ধরো গিয়ে আজকের কথা···কেমন যেন সামলানো যাচ্ছে না!··· মনটা বিলকুল সাফ হয়ে গেছে···তোমরা হয়তো বলবে, বেটাচ্ছেলের কথা শোনো···কিন্তু ভগবানের নামে বলছি, ঠিক যেন ভদ্দরলোদের মতো লাগছে!··· এই তোমাদের বলে রাখছি, কারও কাছে আর একইঞ্চিও মাথা নোয়াব না···তা তোমরা যাই বলো···আর আমাকে তোমাদের ভালো বা খারাপ লাগে—সেকথাটাও বলে ফেলো মন খোল্‌সা করে···আমার তাতে গোঁসা হবে না···আমাকে যা খুশি গালি দাও—বলো না কেন যে পাশ্‌কাটা হচ্ছে একটা চোর, বদমায়েশ! কিন্তু আমি তা মানব না···স্রেফ উড়িয়ে দেব···আর তাই আমার রাগও হবে না—বিশ্বাসই করছি না তা আর রাগ কিসের! আর—আর, জীবনের ধরনটাকে আমি চিনে ফেলেছি···অসিপ, মানুষের সম্পর্কে তুমি যে-সব কথা বলছিলে— তা একেবারে হক্‌ কথা! এ্যাদ্দিন আমি ভাবতাম, তোমার বুদ্ধিটা একটু ভোঁতা···আমার বুঝতে ভুল হয়েছিল···ঠিক কথাই বলেছ তুমি···মানুষ হিসাবে আমাদেরও দাম আছে···'

ফোটানী নিকিতা সারা সকাল একটিও কথা বলেনি। নরম বিষণ্ণ সুরে এই প্রথম বলে :

'আমরা সকলেই···বড়ো দুঃখী···'

চারদিকে একটা খুশির আবহাওয়া, খুশির কথাবার্তা। তার মধ্যে

এই কথাগুলো কেউ খেয়াল করে না—কথাগুলি যে বলেছে তাকেও যেমন দলের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও কেউ খেয়াল করছে না। অবশ্য ইতিমধ্যে লোকটি টইটুম্বুর অবস্থায় পৌঁছেচে; চোখদুটো ভিজে ভিজে, ঢুলছে বসে বসে, চুঁচলো মুখটাকে দেখাচ্ছে শুকনো মেপল পাতার মতো।

'মানুষের জোর আসে কখন? না, মানুষে মানুষে যখন দোস্তি থাকে!' আর্তেমকে বলছে লাপতেভ।

শাতুনভ আমাকে বলে,

'কান খাড়া করে রেখো হে, শব্দগুলোকে ফস্‌কে যেতে দিও না। চাই কি, হয়তো সেই কবিতাটা পেয়েও যেতে পার!'

'ঠিক কবিতাটি হল কিনা কি করে জানব?'

'ঠিক জানতে পারবে!'

'যদি অন্য কোনো কবিতা হয়ে যায়—তাহলে?'

'অন্য কোনো কবিতা?'

সন্দেহের দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে অসিপ। তারপর একটুখানি চিন্তা করে বলে:

'অন্য কোনো কবিতা হতেই পারে না! সব মানুষের জন্যে সুখ নিয়ে আসতে পারে এমন কবিতা একটিমাত্রই আছে—মাত্র একটিই!'

'কিন্তু কি করে আমি বুঝতে পারব, ঠিক ঠিক কবিতাটাকেই পাওয়া গেছে?'

চোখ নামিয়ে রহস্যভরা সুরে ফিসফিস করে বলে সে:

'জানতে পারবে! যে কেউ জানতে পারবে—এ-ব্যাপারে ভুল হবার উপায় নেই!'

ভানোক চেয়ারে বসে উস্‌খুস করছিল। ঘরের মধ্যে এখন ভিড় আর হট্টগোল। সেদিকে উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আফসোসের সুরে বলে:

'ইস্! এ সময়ে যদি একটা গান গাইতে পারা যেত—তবে কী ভালোই না হত!'

তারপরেই হঠাৎ চেয়ারের আসনটাকে জোরে চেপে ধরে আর চেয়ারের মধ্যে কুঁকড়ে গিয়ে অস্ফুট আতঙ্কিত স্বরে ঢোঁক গিলতে গিলতে বলে :

'সব্বোনাশ···মনিব যে!···'

ভদ্‌কা ভর্তি একটা বোতল নিয়ে জিপ্‌সি সেটাকে তাড়াতাড়ি টেবিলের তলায় লুকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বোতলটাকে সরাসরি টেবিলের ওপরে রেখে রাগের সঙ্গে বলে ওঠে :

'লুকোতে যাব কেন? এটা তো পানশালা, যে কেউ আসতে পারে···'

'বটেই তো!' আর্তেম জোর গলায় সায় দেয়। তারপর চুপ করে থাকে সবাই। মনিব তার মেদবহুল বিপুল শরীরটা নিয়ে টেবিলের ফাঁক দিয়ে থপ্‌ থপ্‌ করে বেশ ভারিক্কী চালে আমাদের দলের দিকেই আসছে—আর সবাই এমন ভান করছে যেন মনিবকে দেখতে পায়নি। আর্তেমকেই সবার আগে নজর দিতে হয়, চেয়ার থেকে আধাআধি উঠে হাসি-হাসি মুখে মনিবকে সম্ভাষণ জানিয়ে বলে :

'ভাসিলি সেমিয়োনিচ, ভারি চমৎকার ছুটির দিন আজ, আসুন, আসুন!'

আমদের দল থেকে দু-পা দূরে এসে দাঁড়িয়েছে সেমিয়োনভ। সবুজ চোখটা দিয়ে নিঃশব্দে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছে সবাইকে। মানুষগুলি চুপচাপ; মাথা নুইয়ে প্রণাম সেরে নিয়েছে।

'চেয়ার,' শান্তস্বরে মনিব বলে।

সৈনিক একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের চেয়ারটা এগিয়ে দেয়।

'ভদ্‌কা খাওয়া হচ্ছে বুঝি?' চেয়ারে আরাম করে বসে নিয়ে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে মনিব জিজ্ঞেস করে।

একগাল হেসে পাশ্‌কা জবাব দেয়, 'চা খাচ্ছি আজ্ঞে।'

'বটে! বোতলের মধ্যে চা ভরা ছিল বুঝি···'

ঘরের সবক'টি লোক নির্বাক। উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছে—একটা হুটোপাটি লেগে যায় বুঝি। কিন্তু অসিপ শাতুনভ উঠে দাঁড়ায়.

নিজের গ্লাসটা ভদ্‌কায় ভর্তি করে, তারপর গ্লাসটা মনিবের দিকে বাড়িয়ে ধরে শান্তস্বরে বলে :

'ভাসিলি সেমিয়োনিচ, আমাদের সকলের স্বাস্থ্য কামনা করে পান করুন…'

কি ভেবে নিয়ে যেন মনিব তার ছোট্ট ভারী হাতটা আস্তে আস্তে তোলে। আমাদের সকলের বুকের ওপরে যেন ভারী একটা বোঝা চেপে বসেছে ; বিশ্রী লাগছে আমাদের। মনিব যে কি করবে, বোঝা যাচ্ছে না ; বাড়িয়ে ধরা হাতটা থেকে গ্লাসটা নিজের হাতে নেবে, না, এক ধাক্কায় গ্লাসটা ফেলে দেবে মাটিতে ?

'বেশ তো।' মদের গ্লাসের তলার দিকটা আঙুলে চেপে ধরে শেষকালে মনিব বলে।

'আর আমরাও আপনার স্বাস্থ্য কামনা করে পান করব।'

মনিব তার সবুজ চোখে গ্লাসের পানীয়ের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আর ঠোঁট কামড়াচ্ছে। আবার বলে :

'বেশ তো…ঠিক আছে…এসো তাহলে শুরু করা যাক !'

মুখটা ব্যাঙের মতো হাঁ করে গ্লাসের মদটুকু ছপাৎ করে ঢেলে দেয় সেই ফাঁকের মধ্যে। পাশ্‌কার কালচিটে মুখটায় ফুট ফুট দাগ দেখা যাচ্ছে। কাঁপা কাঁপা হাতে গ্লাসগুলোকে আবার ভর্তি করে নেয়, তারপর আবেগের সঙ্গে বলে :

'ভাসিলি সেমিয়োনিচ, আমাদের ওপরে রাগ করবেন না। আমরাও তো মানুষ, না কি বলুন ! আপনি নিজেও একসময়ে মজুরি করতেন, আপনাকে আর কি বলব…'

'হয়েছে, হয়েছে, আর জ্যাঠামি করতে হবে না।' বাধা দিয়ে দিলদরিয়া সুরে মনিব বলে। তারপর একে একে আমাদের প্রত্যেকের মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নেয়, কি যেন ভাবে, শেষ পর্যন্ত আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মুখ বেঁকিয়ে বলে :

'মানুষ…মানুষ বলছ কাদের…তোমরা কেউ মানুষ নও…জেলফেরত দাগী আসামী সব…এসো, এসো, একটু মদ খাওয়া যাক…'

রুশ মানুষের ভালমানুষিটা এমন যে তার মধ্যে ধূর্ততার ছিটেফোঁটাটুকু সব সময়েই থেকে যায়। এমনি ভালমানুষির মৃদু ঝিকিমিকি ফুটে উঠেছে মনিবের চোখে। আর তা দেখে আমাদের সকলের বুকের মধ্যেও জেগে উঠেছে উদ্দীপনার শিখা। অল্প অল্প হাসি ফুটে উঠেছে আমাদের সবার মুখে, অপরাধীর মতো লাজুক একটা দৃষ্টি নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে সবার চোখে চোখে।

গ্লাসে গ্লাসে ঠোকাঠুকি করে আমরা পানপত্র নিঃশেষ করলাম। নিজেকে চেপে রাখতে না পেরে জিপসি আবার বলে উঠল :

'হক্ কথা বলতে চাই আমি…'

'বকবক কোরো না তো!' হাতের ভঙ্গিতে তাকে থামতে বলে মুখখানাকে বিকৃত করে মনিব বলে, 'আমার কানের কাছে চিল্লিও না! হক্ কথা বলবার জন্যে কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছে শুনি? কাজ করো কাজ—সেটাই আসল কথা…'

'মাফ করবেন! কাজ করা কাকে বলে, তা কি এই তিনদিন আপনি দ্যাখেননি?'

'সেটা নিজেই বুঝে নাও বাপু—তাই ভালো…'

'না। আপনি শুধু এইটুকু আমাকে বলুন—কাজ করা কাকে বলে তা কি আপনি দ্যাখেননি…'

'এই তো চাই।'

'এই তো হবে।'

আমাদের সকলের মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে মনিব মাথা নাড়ে, তারপর আবার বলে :

'এই তো চাই। আমি কিছু বলছি না—ভালো সব সময়েই ভালো! ওহে সৈনিক, ডজনখানেক বীয়ারের হুকুম দাও তো…'

মনিবের কথায় উল্লাসের সুর। সবাই আরো খুশি হয়ে ওঠে। চোখ বুজে বলে মনিব :

'অচেনা লোকদের সঙ্গে বসে আমি পিপে পিপে মদ গিলেছি, কিন্তু আমার আপন লোকদের সঙ্গে বসে বহুকাল মদ খাইনি…'

এইটুকুই বাকি ছিল। জীবনের আনন্দ বলতে যা বোঝায়, তা যে-মানুষগুলির কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, তাদের বুকের ভিতরটা কিন্তু একটুখানি দরদের জন্যে হা-পিত্যেশ করে ছিল। শেষ ফোঁটা তেলের মতো এই কথাটুকু সকলের মনের আগল খুলে দিয়ে গেল। সবাই আরো কাছাকাছি ঘন হয়ে বসেছে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শাতুনভ যেন সবার তরফ থেকেই বলছে :

'আপনি দোষ নিতে পারেন এমন কিছু কিন্তু আমরা একেবারেই করতে চাইনি। ব্যাপারটা কি হয়েছিল জানেন, একে তো গাধার মতো খাটুনি, তার ওপরে শীতকালের কষ্ট—'

আমার মনে হতে থাকে, এই মন-বোঝাবুঝির উৎসবে আমার কোনো স্থান নেই। ক্রমেই যেন বিসদৃশ হয়ে উঠছে ব্যাপারটা। এতক্ষণ ধরে অন্দকার গন্ধের মধ্যে বসে থাকার পরে বীয়ারের নেশাটা চট করে ধরে গেছে। মনিবের আমাটে মুখের দিকে সবাই তাকিয়ে আছে কুকুরের মতো অখণ্ড মনোযোগে—তাদের তন্ময়তা ক্রমেই বাড়ছে যেন। এমন কি মনিবের মুখটাকে দেখে আমারও কেমন অস্বাভাবিক ঠেকছে—সেই মুখ, আর মুখের ওপরে সবুজ চোখে মৃদু অন্তরঙ্গ ও ব্যগ্র চাউনির ঝিকিমিকি।

মনিব কথা বলছে যেন কিছুই হয়নি এমনি সুরে, তার গলায় উত্তেজনা নেই। কথা বলার ভঙ্গিটা এমন যেন খুব ভালোভাবেই জানা আছে—সে যা বলছে তার অর্থ বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হবে না। কথা বলতে বলতে ঘড়ির রুপোলী চেনটা আঙুলে জড়াচ্ছে।

'এখানে কেউ পরদেশী নয়—একই দেশের মানুষ আমরা, না কি বলো, একই জায়গায় আমাদের দেশ…'

'সাবাস! ঠিক কথা! একই দেশের মানুষ!'

লাপতেভের গলার স্বরে তার মস্ত উত্তেজনা ফেটে পড়ে।

'কুকুরের যদি নেকড়ের মতো অভ্যেস হয়, তাহলে কিছু লাভ আছে? গৃহস্থের ঘরে তখন কুকুর দিয়ে কোনো কাজ হয় না…'

হঠাৎ সৈনিকটি তারস্বরে হাঁক দিয়ে ওঠে :

'এ্যাটেম্-শান্! বাহবা, বহুত আচ্ছা!'

মনিবের কুচুটে চোখের দিকে কুৎকুৎ করে তাকাচ্ছে জিপসি, আর কপট স্বরে খেঁকিয়ে উঠছে:

'আপনি কি মনে করেন যে আমি কিছু বুঝি না?'

আবহাওয়াতে আরো খুশির সুর লাগে। আরো এক ডজন বীয়ারের হুকুম দেওয়া হয়। আমার গায়ে ঢলে পড়ে অসিপ আড়ষ্ট স্বরে বলছে:

'মনিব···মনিবই তো বিশপ গো···বড়ো গীর্জের বিশপই তো মনিব!···'

চাপা স্বরে আর্তেম বলে ওঠে, 'ওকে কে এখানে আসতে বলেছে! যতো নষ্টের গোড়া!'

মনিব নিঃশব্দে গ্লাসের পর গ্লাস বীয়ার গলাধঃকরণ করে চলেছে। মাঝে মাঝে এমন অর্থপূর্ণভাবে গলা খাঁকারি দিচ্ছে যেন সে এবার কিছু বলবে। আমার দিকে তার ভ্রুক্ষেপই নেই। মাঝে মাঝে অবশ্য তার চোখের দৃষ্টি এসে পড়েছে আমার মুখের ওপরে কিন্তু সেই চোখের দৃষ্টি ফাঁকা, অন্ধ, তাতে কোনো ভাষা নেই।

সবার নজর এড়িয়ে আমি উঠে পড়লাম। তারপর যখন রাস্তার দিকে চলতে শুরু করেছি, পিছন থেকে আর্তেম আমাকে ধরে ফেলল। দু-হাতে মুখ ঢাকা, কাঁদছে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছে:

'ভাইটি···আমার আর কেউ সঙ্গী রইল না···কেউ না।'

মনিবের সঙ্গে আমার রাস্তায় বারকয়েক দেখা হয়েছিল। যতো বারই দেখা হয়েছে অমরা নমস্কার বিনিময় করেছি, আর সে যথোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে গোবদা হাতে মাথার গরম টুপিটা খুলে জিজ্ঞেস করেছে:

'কেমন চলছে?'

'এই চলে যাচ্ছে আর কি।'

'ঠিক আছে, চলুক।' এই বলে সে নিজের সম্মতি জানিয়েছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে আমার পরনের পোশাক, তারপর গম্ভীর মুখে নিজের বিপুল দেহটাকে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে গেছে।

একদিন সাক্ষাৎ হয়েছিল একটা পানশালার সামনে। মনিব প্রস্তাব করল :

'কি বলো হে, একটু বীয়ার খাওয়া যাক না ?'

চার ধাপ নিচে নেমে আধা-নিচুতলার একটা ছোট ঘরে আমরা ঢুকলাম। ঘরের যে কোণটা সবচেয়ে অন্ধকার, বেছে বেছে সেখানে গিয়ে বসল মনিব। ভারী ভারী পায়াওলা একটা টুলে শরীরের ভর রেখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল চারদিকে। যেন ঘরের টেবিল গুণছে। ঘরের মধ্যে টেবিল আছে পাঁচটি—আমাদেরটি ছাড়া ; লালচে-ধূসর কাপড়ে সবকটি টেবিল ঢাকা। কাউণ্টারের পিছনে বসে আছে ছোট্ট এক বুড়ী, একমাথা পাকা চুল, গায়ে গাঢ় রঙের শাল জড়ানো ; বসে বসে ঢুলছে আর মোজা বুনছে।

ছাইরঙা পাথুরে দেওয়াল ; এত শক্ত যে ভাঙাচোরা যাবে না। চৌকো চৌকো ছবি দিয়ে দেওয়াল সাজানো। একটা ছবিতে নেকড়ে শিকারের দৃশ্য ; আর একটা ছবিতে জেনারেল লোরিস-মেলিকভের প্রতিকৃতি, ভদ্রলোকের একটা কান নেই ; তৃতীয় ছবিটি জেরুজালেমের ; চতুর্থ ছবিতে একজোড়া বুকখোলা মেয়ে, তার মধ্যে একটি মেয়ের চওড়া বুকটার ওপরে বড়ো বড়ো ছাপার হরফে লেখা আছে—'ভেরা গালানোভা, ছাত্রদের প্রিয়পাত্রী, মূল্য তিন কোপেক মাত্র' ; অপর মেয়েটির চোখদুটি খাবলা মেরে বার করা নেওয়া হয়েছে, সে জায়গায় দুটো সাদা সাদা দাগ, বেখাপ্পা আর উদ্ভট, দেখে ভারী মন খারাপ হয়ে যায়।

দরজার কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে, একটা নতুন-তৈরি বাড়ির সবুজ ছাদের ওপর দিয়ে সন্ধ্যার ঝলসে-ওঠা আকাশ, আর অনেক উঁচুতে অসংখ্য দাঁড়কাক উড়ে বেড়াচ্ছে।

ঘড় ঘড় শব্দে মনিব শ্বাস টানছে ; গুমোট জায়গাটাকে দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে ; আর অলসভাবে আমাকে নানা প্রশ্ন করে চলেছে—যেমন, আমি কত আয় করি, আমার কাজে আমি খুশি কিনা, এইসব। স্পষ্টই বোঝা যায়, কথা বলতে তার ভালো

লাগছে না, রুশদেশের মানুষের যেমন মাঝে মাঝে সারা দেহকে অবসন্ন করে এক অদ্ভুত ধরনের ক্লান্তি আসে—তেমনি এক ক্লান্তিতে ভুগছে সে এখন। একটু একটু করে চুমুক দিয়ে বীয়ার নিঃশেষ করল, তারপর শূন্য গ্লাসটা টেবিলের ওপরে রেখে হাত দিয়ে একটা টোকা দিল। গ্লাসটা উল্‌টিয়ে পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু গড়িয়ে যাবার আগেই আমি ধরে ফেললাম।

শান্ত স্বরে মনিব বলল, 'ধরতে গেলে কেন ?·· মাটিতে পড়লেই তো ভালো হত···কেমন ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেত···আমি অবশ্য দাম চুকিয়ে দিতাম···'

সন্ধ্যার উপাসনার ডাক জানিয়ে গির্জার ঘণ্টাগুলি দ্রুত বেজে উঠেছে। সেই শব্দে শূন্যে দাঁড়কাকগুলি চমকে উঠে ডানা ঝটপট করতে লাগল।

একটা কোণের দিকে আঙুল বাড়িয়ে মনিব বলে চলেছে: 'এ ধরনের জায়গাই আমার পছন্দ। কেমন চুপচাপ···মাছির উপদ্রব নেই···মাছিগুলো রোদ্দুর ভালোবাসে, রোদ্দুরের তাপ···'

বলতে বলতে সে হঠাৎ দুর্বোধ্য হাসি হেসে উঠেছে।

'সেই বোকচণ্ডী সোভকার কাণ্ড শোনো···ও গিয়ে এক ডীকনের সঙ্গে জুটেছে···লোকটার টাক-মাথা, কিম্ভুতকিমাকার চেহারা···আর না বললেও চলে যে লোকটা একেবারে পাঁড় মাতাল···বৌ মরে গেছে···মেয়েটার কাছে সে ধম্মবইয়ের শোলোক বলে আর মেয়েটা হাপুস হয়ে কাঁদে···আর আমার ওপরে মেয়েটার কী চোটপাট···তবে আমি···আমার বয়েই গেছে··· ব্যাপার দেখে আমার তো মজা লাগে···'

কি যেন বলতে গিয়ে শব্দগুলো তার গলায় আটকে গেল। তারপরে হাল্‌কা সুরে বলে চলল আবার:

'আমার কি মতলব ছিল জান, তোমাদের দুজনের বিয়ে দেব—তোমার আর সেফিয়ার···কে জানে তোমাদের দুজনে মিলমিশ হত কিনা!···'

কথাটা শুনে আমারও মজা লেগেছিল। আমি হেসে উঠেছিলাম। আমার হাসি শুনে সেও না হেসে থাকতে পারেনি। অস্ফুট গোঙানির মতো একটুখানি হাসি।

হস্ত কচলে কচলে বিসদৃশ দুই চোখ থেকে কয়েক কণা জল মুছে নিয়ে সে বলল :

'অপিসের কথা মনে আছে ? তার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা বলো তো ? লোকটা চাকরি ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে গেছে··· আস্ত গর্দভ···'

'কোথায় গেছে ?'

'শুনছি, তীর্থ্যো করতে বেরিয়েছে নাকি···লোকটা যা কাজ শিখেছিল আর ওর যা বয়েস তাতে এতদিনে ওর বড়ো মিস্ত্রী হয়ে যাওয়া ছিল। হ্যাঁ, লোকটা সত্যিই ভালো কাজ জানত, আনাড়ি নয়···'

বলতে বলতে মাথা নাড়তে লাগল। খানিকটা বীয়ার খেল চুমুক দিয়ে, তারপর দুই হাতের জোড়া-তালুর নিচ দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মন্তব্য করল :

'কতগুলি দাঁড়কাক উড়ছে দেখছ ! বিয়ের সময় এসে গেছে···আচ্ছা বক-বক-মহারাজ, বলতে পার আমাকে—কোন্ জিনিসটা বাড়তি আর কোন্ জিনিসটা সত্যিকারের দরকারী ? এ প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব কেউ জানে না ···সেই ভীকম বলে, দরকারী জিনিসটা হচ্ছে মানুষের জন্যে···বাড়তি জিনিসটা ভগবানের জন্যে !···বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই, লোকটা মাতাল অবস্থায় কথাগুলি বলেছিল। নিজের নিজের সাফাই গাইতে তো সবাই চায়···এই শহরেই কি বাড়তি মানুষ কম, প্রচুর বাড়তি মানুষ···শুনে চমকে উঠতে হয় ! সবাই গিলছে, সবাই টানছে—বলতে পার, এদের খাদ্য-পানীয় যোগায় কে ? কোত্থেকে আসে এসব ?···বলো তো দেখি ?···'

হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল। একটা হাত ঢুকিয়েছে পকেটে, আরেকটা হাত আমার দিকে বাড়ানো। মুখের ভাব এমন যেন সে উধাও হয়ে গেছে, আর তাকিয়ে আছে সরু সরু চোখে ভুরু কুঁচকে।

'আর বলবার সময় নেই। চললাম।'

একটা পেটমোটা কুমড়নো মনিব্যাগ বার করে আলগোছে ভিতরে হাতড়াতে লাগল।

'ও হ্যাঁ, থানার দারোগা সেদিন তোমার খোঁজ করতে এসেছিল···'

'কী বলল এসে?'

কোঁচকানো ভুরুর তলা দিয়ে আমার দিকে তাকাল মনিব তারপর নিস্পৃহ গলায় বলে চলল :

'এই জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার স্বভাবচরিত্তির কেমন, কথাবার্তা কি রকম ···আমি বললাম যে তোমার স্বভাবচরিত্তির মন্দ আর কথাবার্তা রাশছাড়া। আচ্ছা চলি!'

এক ধাকায় দরজাটা হাট করে খুলে থামের মতো পাদুটো জীর্ণ সিঁড়ির ওপরে শক্তভাবে পাতল, তারপর মস্ত ভুঁড়িটাকে ঠেলে তুলল রাস্তায়।

মনিবের সঙ্গে আমার আর কোনো দিন দেখা হয়নি। কিন্তু বছর দশেক বাদে ঘটনাচক্রে নিতান্তই আকস্মিক ভাবে আমি জানতে পেরেছিলাম, তার ব্যবসা-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আমি তখন রাজবন্দী, কারাগারের পাহারাওলা একদিন আমাকে খবরের কাগজে মুড়ে খানিকটা সসেজ দিয়েছিল। খবরের কাগজের সেই টুকরোটায় নিচের সংবাদটি আমি পড়েছিলাম :

'গুড ফ্রাইডে দিবসে আমাদের এই শহরে অদ্ভুত এক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। রুটি ও বিস্কুটের কারখানার মালিক, ব্যবসায় জগতে সুপরিচিত, ভাসিলি সেমিয়োনিচ সেমিয়োনভ এইদিন শহরের রাস্তায় রাস্তায় অশ্রুসিক্ত চোখে ছুটাছুটি করিয়াছিলেন। উত্তমর্ণদের বাড়ি বাড়ি গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি তাহাদের বলেন যে তাঁহার সর্বস্ব খোয়া গিয়াছে এবং তাঁহারা যেন তাঁহাকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করেন। তাঁহার ব্যবসায়ের সমৃদ্ধিশালী অবস্থার কথা সকলেরই জানা ছিল সুতরাং কেহই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করে নাই। এই ভদ্রলোকের চালচলন বেয়াড়া, তাঁহার নানা বাতিকের কথা সকলেই ভালোভাবে জানে—সুতরাং ছুটির কয়েকটা দিন কারাগারে কাটাইবার জন্যে তাঁহার সনির্বন্ধ অনুরোধ শুনিয়া সকলেই হাসিয়াছিল। কিন্তু দিন কয়েক পরে যখন টের পাওয়া যায় যে সেমিয়োনভের কোনো হদিশ নাই, তিনি একেবারেই নিখোঁজ, বাজারে তাঁহার পঞ্চাশ হাজার রুবল দেনা, তাঁহার কারখানায় যাহা কিছু বিক্রয়যোগ্য পদার্থ ছিল কিছুই আর অবশিষ্ট ই—

তখন ব্যবসায়ী মহল স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে! নিঃসন্দেহে ইহা জুয়াচুরির মতলবেই দেউলিয়াপনা।"

তারপরে বিবরণ আছে, দেউলিয়া পলাতক ব্যক্তিটির খোঁজখবর করার সমস্ত চেষ্টাই কি-ভাবে ব্যর্থ হয়েছে, উত্তমর্ণরা কি-রকম বিভ্রান্ত, সেমিয়োনভের নানা বেয়াড়াপনার কত-কি ঘটনা। সেই তেলকালি-মাখা নোংরা কাগজের টুকরোটা পড়ে চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে আমি জানলার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, এই দেউলিয়াপনা, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে জুয়াচুরি, অপরিণামদর্শিতা আর দুর্ভাগ্য, আর এই যে জীবনবোধ, যার মধ্যে আছে চৌর্যবৃত্তি, কাপুরুষতা ও নপুংসকতা—এ তো রুশদেশে আমাদের জীবনে প্রায়ই ঘটে থাকে!

এ কোন্ ব্যাধি? এ কোন্ সর্বনাশ?

এই হয়তো একজন মানুষকে দেখা গেল যে বেঁচে থাকতে এবং কিছু একটা সৃষ্টি করতে চায়, নিজের অভিপ্রায়ের সীমানার মধ্যে জড়ো করে আরো অজস্র মানুষের মস্তিষ্ক ইচ্ছা ও শক্তি, গ্রাস করে বহু মানুষের কর্মক্ষমতা; তারপরেই হয়তো দেখা যাবে, খামখেয়ালী ভাবে এবং আচমকা সে মাঝপথেই অসমাপ্ত অবস্থায় সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে পালা চুকিয়ে দিয়েছে। এমন কি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে জীবন থেকে—তাও হয়তো প্রায়ই দেখা যাবে। এইভাবে মানুষের অনেক দুশ্চর পরিশ্রম নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যায়, অনেক যন্ত্রণাকর প্রসবের ফল অকালেই ঝরে পড়ে।

জেলখানার পাঁচিলটা পুরনো, নিচু, চোখে ভয় জাগে না। আর এই পাঁচিলের ঠিক পরেই বসন্তের স্নেহসঞ্চারী আকাশকে ছুঁয়েছে একমাত্র ভাটিখানার লাল-ইটের স্তূপ, তারপরেই একটা নতুন আবাস-বাড়ি তৈরি করবার জন্যে বাঁশের ভারা বাঁধা হয়েছে।

তারপরে অনাবাদী জমি। সবুজ ঘাসে ঢাকা। মাঝে মাঝে সেই জমিকে চিরে দিয়ে গেছে গভীর খাদ। ডানদিকে ইহুদিদের কবরখানা, তারই গা ঘেঁষে একটা গিরিবর্ত্ম, ধারে ধারে এক দঙ্গল থমথমে গাছ।

মাঠে মাঠে সোনালী রঙের বাটারকাপ ফুলের লীলায়িত ছন্দ। একটা কালো গোব্‌দা মাছি গোঁয়ারের মতো জানলার নোংরা শার্সিটার ওপরে মাথা ঠুকে ঠুকে মরছে। মনে পড়ে, শান্তভাবে বলা মনিবের কতগুলি কথা :

'মাছিগুলো রোদ্দুর ভালোবাসে, রোদ্দুরের তাপ…'

হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে ওঠে পানশালার নিচুতলার অন্ধকার কামরাটা। খুশির রঙে রাঙানো সারি সারি অসংবদ্ধ ছবি—নেকড়ে শিকারের দৃশ্য, জেরুজালেম শহর, ভেরা গালানোভা 'মূল্য তিন কোপেক মাত্র', কানকাটা জেনারেল।

মনিব বলেছিল, 'এ ধরনের জায়গাই আমার পছন্দ।' বলতে বলতে মানবিক আবেগ এসেছিল মনিবের গলার স্বরে।

মনিবের চিন্তা আমাকে পেয়ে বসুক, তা আমি চাইনি। জানলার বাইরে না তাকিয়ে আমি তাকিয়ে আছি মাঠের ওপারে। মাঠের ধার ঘেঁষে নীল অরণ্য, অরণ্যের শেষে উৎরাই পেরিয়ে ভল্‌গা। মহিমান্বিত নদী ভল্‌গা। যেন বিপুল উচ্ছ্বাসে বয়ে চলেছে মানুষের আত্মার ভিতর দিয়ে, অপ্রয়োজনীয় অতীতকে ধুয়েমুছে তকতকে করে দিয়ে যাচ্ছে।

'আচ্ছা, বলতে পার, কোন্ জিনিসটা বাড়তি আর কোন্ জিনিসটা সত্যিকারের দরকারী?' মনিবের কথাগুলো কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

বিপুল বপু সমেত সেই লোকটিকে আমি দেখতে পাচ্ছি যেন। ঘোড়ার গাড়ির কামরায় গা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে, গাড়ির গতির সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকুনি খাচ্ছে শরীরটা, আর সবুজ চোখটার তীব্র দৃষ্টি দিয়ে সে তাকিয়ে আছে জীবনের দ্রুত আবর্তমান স্রোতের দিকে। কোচোয়ানের আসনে ইয়গরের কাঠের মতো মূর্তি, দড়ির মতো টান করে দু-হাত বাড়ানো, আর লম্বা লম্বা শক্ত পা ফেলে ছুটছে কটারঙের বদমেজাজী ঘোড়াটা, রাস্তার ঠাণ্ডা পাথরের ওপরে ঘোড়ার খুরের ঠোকর লেগে সজোরে শব্দ হচ্ছে—খট্ খট্ খট্।

'ইয়েগ—আমি কার? ভেড়া খেয়ে উদরপূর্তি করে—কিন্তু পোড়া কপাল তার…জ্বালাযন্ত্রণা শেষ হয় না!'

মনে হতে থাকে, বুকের মধ্যে কি যেন একটা দলা পাকিয়ে উঠে দম বন্ধ করে দিতে চাইছে। বুকটা যেন কেঁপে উঠছে, বুক ছাপিয়ে উঠছে একটা যন্ত্রণাভরা করুণা। করুণা একজন মানুষের কথা ভেবে—যে মানুষ জানে না নিজেকে নিয়ে সে কি করবে, যে মানুষ পৃথিবীতে ঠাঁই খুঁজে পায় না। কেন? কে জানে! শুধুই কি কুঁড়েমি; শুধুই কি 'পণ্টনীর' মতো দাসমুলভ বিবেকদংশন? তা নয়, হয়তো অদম্য প্রাণোচ্ছ্বাসের জন্যেও।

সেই করুণার অনুভূতি আসে তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণার মতো। মানুষটা কে, তাতে কিছু যায় আসে না। এ করুণা এসেছে একটা পর্যুদস্ত প্রাণের ভরাডুবি দেখে। দুষ্ট ছেলে যেমন মায়ের মনকে দোলা দেয় ও বিরোধী ভাবের সঞ্চার করে—এও তাই। সেক্ষেত্রে যতোই আদর করতে ইচ্ছে জাগুক না কেন, জোরে ঘা দিতেই হবে।

মস্ত একটা লাল স্তূপের মতো নতুন বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। ভারা বাঁধা হয়েছে চারদিকে। চুনে মাখামাখি পাটাতন। তারই ওপর দিয়ে গুড়ি মেরে মেরে চলাফেরা করছে একদল ক্ষুদে ক্ষুদে মূর্তি। ইটের পর ইট সাজিয়ে চলেছে। মৌমাছির মতো ঝাঁক বেঁধে রয়েছে বাড়িটার মাথার কাছে। দিনের পর দিন বাড়ির মাথাটাকে ধাক্কা মেরে মেরে উঠিয়ে নিয়ে আসছে উঁচুতে, আরো উঁচুতে।

মানুষের এই ব্যস্ত কর্মপ্রবাহের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়ে আরেকজনের কথা। এই বিপুল ও জটিল পৃথিবীর গোলকধাঁধার মতো রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে পা ফেলে চলেছে সেই নিঃসঙ্গ পথিক। অলিপ্ত শান্তমভ। অবিশ্বাসী চোখে তাকাচ্ছে চারদিকে, কান পেতে শুনছে কে কি কথা বলে—হয়তো একদিন এইসব কথা থেকেই পাওয়া যাবে সেই 'কবিতা যা সবাইকে সুখী করে তুলবে'।